বাংলা ভাষা

ও

বাংলা ভাষী

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২০২১)
উপলক্ষে নিবেদিত সাহিত্য সঙ্কলন

সঙ্কলনঃ পাণ্ডুলিপি (গল্প,কবিতা,গান,গদ্য ও নাটকের আসর)

https://www.facebook.com/groups/183364755538153

বাংলা ভাষা

ও

বাংলা ভাষী

সঙ্কলন

পাণ্ডুলিপি (গল্প,কবিতা,গান,গদ্য ও নাটকের আসর)

সম্পাদনা

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

সহ সম্পাদনা, প্রুফ সংশোধন ও স্টাইলিং

রাজশ্রী দত্ত

উপদেষ্টা

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

পাণ্ডুলিপির যে সমস্ত সদস্যরা এই নিঃশুল্ক ই-গ্রন্থটি (complimentary e-Book) প্রকাশে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশে থাকুন, বাংলা পড়ুন, বাংলা ভাষার প্রচার করুন। আসুন, হাতে হাত রেখে সুসাহিত্য সৃষ্টির পথে এগিয়ে যাই।

(‘Bangla Vasha O Bangla Vashee’ is a collection of Bengali articles, blogs, poems and stories written by a few contemporary Bengali writers from India and Bangladesh. This e-book contains literary works only, and it has no provocative elements inside. The contents are completely free from all kinds of (or potential) social, economic, political, racial and psychological instigations. It is meant for free circulation among the members of Pandulipi Literary Association.)

উৎসর্গ

'পাণ্ডুলিপি'র তরফ থেকে প্রিয় সুহৃদ, বিচক্ষণ উপদেষ্টা এবং সুআদর্শবান পথপ্রদর্শক — পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক স্বর্গীয় শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণে আমাদের এই ই-গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হল।

শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায়

জন্মঃ ৩রা অক্টোবর ১৯৫৬ ❋ প্রয়াণঃ ৬ই ডিসেম্বর ২০২০

নয়নের আড়াল হলেও, মনের গহীনে ও বাংলা ভাষার মণিকোঠায় তুমি রইবে চিরদীপ্তমান অনুপ্রেরণা-রূপে...

প্রণত: পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)-এর সদস্যবৃন্দ...

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০২১

মুখবন্ধ

প্রত্যেক জাতির ভাষা যেমন তার নিজেস্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং স্বাতন্ত্র্যের দ্যোতক, ঠিক তেমনি আমাদের অর্থাৎ সকল বাংলা ভাষীর কাছে এই বাংলা ভাষা প্রাণস্পদ, সুললিত, খাঁটি মধুর মতো প্রিয়তম ভাষা। আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে বাংলা ভাষার শিকড় প্রসারিত, সবদিক থেকে মানুষের ভালোবাসার রস সংগ্রহ করে, এই ভাষা এক জীবন্ত মহীরুহের মতন বিকশিত হয়ে উঠেছে ক্রমাগত। বলা যায়, বাংলা ভাষা হল একমাত্র এমন একটি ভাষা, যার শৈল্পিক সৌন্দর্য মানুষকে দেয় নান্দনিক আত্ম-তৃপ্তি। তাই এই মাতৃ দুগ্ধসম মিষ্টি ভাষার মিষ্টত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলার কাঙ্খিত প্রয়াস নিয়ে পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)-এর একটি ক্ষুদ্র উপস্থাপনা হল "বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী" ই-বুক (ই-গ্রন্থ)। শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয়, এর সাথে বাংলা ভাষী সকল মানুষের আবেগ-অনুভূতি, সাহিত্য ভাবনা-সংস্কৃতির কথা তুলে ধরাই এই প্রয়াসের মূল লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ স্মরণে লেখায় লেখায় বিঘোষিত হোক বাংলা ভাষার জয়গান। ■

"বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবি হোক", এই কামনা নিয়ে...

বিনীতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন

বিনীতাঃ রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সকল পাঠক এবং শুভানুধ্যায়ীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই ই-গ্রন্থটিকে বিভিন্ন মাধ্যমে শেয়ার করুন। আমরা আপনাদের সম-আলোচনার অপেক্ষায় থাকব। আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com ।

একুশের স্মরণে

অমিতাভ চক্রবর্তী

ভালোবাসি বাংলাকে ভালোবাসি ভাষাকে
এই ভাষার সাথেই হাঁটি আজ এই শুভ লগ্নে
বাংলা ভাষার ঝঙ্কার একুশেই একাকার!

একুশ আমার প্রেরণা আমার স্বাভিমান,
একুশ আমার অহংকার আমার গর্ব।
তোমার মুখের ভাঁজে লেখা
দুঃখগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণত হই।
উষ্ণতায় ঘেরা সজল একান্ত অনুভব
আব্দুল, জব্বার, রফিক ভাষা শহীদের
স্মরণে একগুচ্ছ রক্ত গোলাপ কবিতায়
ধ্বনির বিদ্যুত চমক!
একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের গায়ত্রী প্রভাত।

প্রতি বছর একুশ আসে একুশ যায়
একুশ কি মাত্র দিনাঙ্কের ইতিহাস?
শুধুই কি স্মৃতি কাতরতা?
স্বপ্ন প্রত্যাশা খুঁজি চেতনার মোহনায়।
আমরা তামাম বাঙালী সবাই ঋণী
একুশের কাছে।

কবিতা

সকল মাতৃভাষাই আনুক নব চেতনার তন্ত্র
জাগবার আর জাগাবার মন্ত্র।
ভাষা হোক আমাদের বৈভব ঐশ্বর্য।

ভাষা শহীদের বুকে গেঁথে বার বার দাঁড়াই
যেন শহরের রক্ত রাঙা পথে যেথায়
রক্তের আলপনায় ধুলায় লুটায়!
বাংলার বীর ছেলেরা আজ জেগে আছে-
আজও তাই ফাল্গুনে পলাশ শিমুলেরা কবিতা হয়।
এই বীর ছেলেরা ছাড়া কে তোমাকে সম্রাজ্ঞী
সাজাবে এমন রক্তের অলংকারে। ■
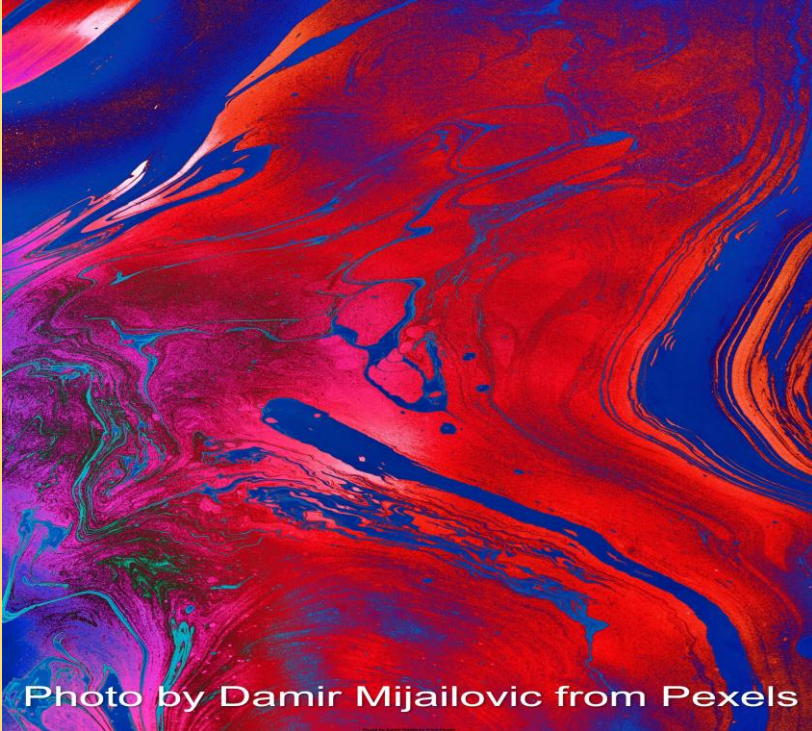
Photo by Damir Mijailovic from Pexels

কবিতা

অ্যালবাম

সিদ্ধার্থ বসু

শীতঘুমে চলে যাওয়া স্বপ্নের এপিটাফ,
মজে যাওয়া শোকতাপ,
নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়া ভালোবাসার অ্যালবাম,
রোদ্দুরে চুঁইয়ে ঝরে টুপ করে হৃদ্ মাঝারে।

বোধের দেউড়িতে কড়া নেড়ে যায়,
সদর্থক দায়বদ্ধতা...
প্রত্যাশার ফানুস চুপসে যায়,
আতিশয্যের বাহারে।

যন্ত্রনার সাতকাহন...
অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের ফুরিয়ে যাওয়া আগ্রহে,
চোরাবালি আর তমসার বিনির্মাণ,
রক্তাক্ত অক্ষরমালার নিটোল বুনটে,
ষোলকলায় পূর্ণ হয় ছন্দসংবেদ দর্পণ।

দহনক্লান্ত মননে আশ্লেষ,
২১ শে ভাষা বিপ্লব দিবস,
শব্দবোধের সংবেদ ও এক অসংজ্ঞেয় স্বজ্ঞা,
কৃষ্টি ও সৃষ্টির মেল বন্ধনের প্রজ্ঞা।। ■

ছবির নামঃ সেকালের দু'তলা বাড়ি, কামারপুকুর...
আলোকচিত্র গ্রহণে রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

শহীদ স্মরণে

নন্দিতা চৌধুরী

ভূমিষ্ঠ হয়েই মা বলে ডেকেছি
অজ্ঞানে যে ভাষায়,
আত্মার মাঝে গ্রথিত না হলে কি
এ ভাষায় ডাকা যায়?

সে ভাষা আমার মায়ের ভাষা বাংলা তার নাম,
অফুরান জ্ঞান ভাবনায় পূর্ণ শব্দ বর্ণের এক ধাম!

প্রাণাধিক প্রিয় যে ভাষায় জানাই, দুঃখ ভালোবাসা,
জন্মগত অধিকার এ ভাষায় বাঙালির, এ তার মাতৃভাষা।

দাবী করেছিল তাই বাঙালি এ ভাষার রাষ্ট্রীয় সম্মান,
বাতিল হয়েছিল বারবার এ দাবী, তাচ্ছিল্যে হয়ে ম্লান।

আহত ছাত্রদল চূড়ান্ত এ ফয়সালার প্রতিবাদে করে কলরব,
উনিশ শো বাহান্নের একুশে ফেব্রুয়ারী ঘোষিত হয় বিপ্লব...

বন্দুকের গুলি বৃথা চেষ্টা করেছিল, এ দাবীকে করতে স্তব্ধ...
চার-চারটি তরুণকে নিষ্প্রাণ করে কি করতে পেরেছিল জব্দ?

হাজার সাফিয়ুল, বরকত আর রফিক, জব্বরেরা, দলে দলে
জানিয়েছিল প্রতিবাদ,
যায় যাক্ প্রাণ, বাংলা ভাষাকে আওল মাটিতে বাংলার,
করতে হবেই আবাদ!

কবিতা

এ লক্ষ্যের তাড়নায়
তরুণদল করে জীবন মরণ যুদ্ধ,
রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি দিতে
বাংলাকে, শেষ পর্যন্ত করে বাধ্য !

এ পারের বাঙালি করেছিল এ সংগ্রামের পূর্ণ সমর্থন,
দুপারের বাঙালি পরস্পর নৈকট্যে করেছিল আলিঙ্গন!

হয়েছিল শহীদ যাঁরা দিয়ে প্রাণ,
আমার ভাইযান,
তাঁদের কে আজ স্মরণ করি
আমি সসম্মান!

সমগ্র বাঙালি সমৃদ্ধিতে বাংলার,
করব আদর যত্ন,
বুকের মাঝে সামলে রাখব
বাংলাভাষা রূপী এ রত্ন! ■

Photo by Anna Shvets from Pexels

মোদের নিজের ভাষা

শীলা মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, “মাতৃভাষা আমাদের চিন্তার জননী, আমাদের আত্মিক জীবনের পরিচালিকা।” সারাদিনের এত ভাবনা, চিন্তা, আনন্দ, বেদনা যা প্রকাশ না করলেই নয়, কিভাবে সম্ভব অনর্গল স্বতস্ফূর্ত বাংলাভাষা ছাড়া? যখন কথা বলছি, সেই বলার মধ্যেও কত দিক। যিনি কাজের জায়গায় ভাষার দিক দিয়ে কেতাদুরস্ত, তিনিই হয়তো বাড়িতে আটপৌরে কথা বলেন। লিখিত ভাষার মধ্যেও কত ভাগ। কবিতার জন্য ভাল ভাল শব্দের জন্য কত প্রয়াস। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের জন্য আবার আলাদা।

আর একটা খুব চমৎকার লিখিত ভাষার মাধ্যম ছিল চিঠি। তাতে যিনি লিখছেন তাঁর মনের অনেকখানি হদিস পাওয়া যেত। তার জন্য ভাষার দখলদারি থাকলে ভাল। আর তা না হলেও ক্ষতি নেই। সাদামাটা, সদ্য অক্ষর পরিচিত হওয়া বা যতিচিহ্নের উপযুক্ত ব্যবহারের প্রয়োগ না করা – এরকম চিঠির আবেদনও ছিল পূর্ণ। চিঠির প্রসঙ্গে মনে এল, সত্যজিৎ রায়ের **“সমাপ্তি”** ছবির সেই ছোট্ট চিঠিখানা! **“তুমি ফিরে এসো। ইতি পাগলী।”** কত কিছু বলা

হয়ে গেল মাত্র কতগুলি শব্দ দিয়ে। যদিও চিঠির ভাষা এখন ইতিহাস। আর ডায়েরি। ধারাবাহিকভাবে নিজের ভাল খারাপ সবটা নিয়ে নিজেকে মেলে ধরা। নিজের সাথে নিজের ভাষায় কথা বলা।

"ভাষা এমন কথা বলে বোঝেরে সকলে, উঁচানিচা ছোট বড় সমান।" গানের এমন অনেক সম্পদ উপচে পড়ছে বাংলার ভান্ডারে। মনের গতির সাথে ভাষার যে মেলবন্ধন তার হদিস পাই লোকসঙ্গীতে। প্রথমটা পড়ে বা শুনে হয়তো সাদামাটা লাগে। কিন্তু অন্তর দিয়ে ভাবলে এর দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। বাংলার বাউল যখন গানের মাঝখানে হঠাৎ করে গানের একটা অংশ খুব জোর দিয়ে বলেন তখন তাঁর সেই প্রান্তিক গানের ভাষার সাথে চটকদারী ব্যস্তবাগীস বাঙালির জীবনচর্চার ভাষা আবার মেলেনা। কবি রামপ্রসাদ সেন হিসেবের খাতায় একের পর এক গান লিখে যান, তা দেখে জমিদারের মাথা শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসে। **"এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।"** এই বাংলা ভাষা পড়ে মনে হয়না, এই একটা জন্মেই জন্মান্তর সম্ভব?

"সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য করা

হয়।" একথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। তাঁর রচনায় বাংলা ভাষার পাশাপাশি অনেক সংস্কৃত শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে প্যারিচাঁদ মিত্রের **"আলালের ঘরে দুলাল"** "বাংলা সাহিত্যে নতুন একটা চেহারা নিয়ে এল। চরিত্রের সাথে মানানসই হয় এমন কিছু অমার্জিত শব্দও তিনি বসিয়েছেন, তবে তাতে বাংলা ভাষার অমর্যাদা তো হয়ইনি, বরং তৎকালীন বাঙালি যে ভাষা বলে ও বোঝে – তিনি সেই চেষ্টাই করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী যাঁকে বলেছেন, **"আলালি ভাষা**।" এই ভাষার আরেক উদাহরণ **"হুতোমের নক্সা**।" তিনি আরও বলেন, **"ভাষা যদি স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করে, তবে লেখকের কলমে সে কথা বলে, গান করে, নৃত্যশীল হয়ে পড়ে, ভাষা তখন নমনীয়, কমনীয় দৃঢ় হয়ে ওঠে প্রয়োজনবোধে**।" এরপর আসেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে। এবার বাংলাভাষার উচ্চ ধ্রুপদী রূপ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে ফুটে উঠল।

বাংলাভাষার বানান আর তার সুললিত প্রকাশ বিশেষ করে রোজকার চলিত বাংলা নিয়ে নিরন্তর চর্চা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেননি। তাঁর দেখানো আধুনিক পথে এখনও অনেক সাহিত্য তৈরী হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের রচনা আমজনতার কাছে কতখানি পৌঁছেছিল, তা বোঝা যায় তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে। সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষায় তাঁর সৃষ্ট এক-একটি চরিত্র এমন

আবেগমথিতভাবে লিখিত যে, মনে দাগ কেটে যায়।

জনগণের সাথে সহজে যোগাযোগ এবং তাদের সচেতন করার কাজটিতে বিবেকানন্দ চলিত কথ্যভাষা বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর পরিব্রাজক, প্রাচ্য পাশ্চাত্য ছাড়াও পত্রাবলীও এর উদাহরণ।

মুজতবা আলীর কথা একটু বলি। তাঁর পান্ডিত্য এবং অসম্ভব রসিকতাবোধ সমৃদ্ধ ভাষা অত্যন্তই জনপ্রিয় বাঙালির কাছে। **"তাঁর রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তাঁর মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর কলমের গুণে তাঁর ব্যবহৃত শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তাঁর ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়।"** একথা বলেছেন তাঁরই অগ্রজ ভাই সৈয়দ মূর্তাজা আলী।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপাধি দিয়েছিলেন ভাষাচার্য। তাঁর লেখা **(ওডিবিএল) 'দি ওরিজিন এন্ড ডেভালপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাংগুয়েজ"** নামক বইটি যাঁকে দেশবিদেশের খ্যাতি এনে দিলেন তিনি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়। বাংলাভাষা জগতে তাঁর অবদান চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

সুকুমার সেন ভাষাতত্ত্বের আর এক দিকপাল, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী এবং সুযোগ্য শিষ্য, তিনিও রয়ে যাবেন শিক্ষিত বাঙালির মন ও মননে।

আমার জানার অতি ক্ষুদ্র পরিসরে কিছুজনের নামই বললাম শুধু। বাংলাভাষার কথা বলতে আরও কত প্রণম্য বাঙালির কথা মনে হয়। সবার কথা আর বলতে পারলাম কই?

এত সুন্দর, মিষ্টি, জীবন্ত, বহুমুখী ভাষাকে না ভালবেসে, না আপন করে পারা যায়না। মাতৃভাষা যদি মা হন, তবে তাঁর সাথে সব অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া যায়। শুধু অবজ্ঞা করা যায়না বোধহয়। আর সবশেষে,

"এই দেখ পেনসিল, নোটবুক এ হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিলবিল লেখাতে।
ভাল কথা শুনি যেই চট পট লিখি তায়-
ফড়িঙের কটা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায়।"

(সুকুমার রায়)

এইসব আজব ও নির্ভেজাল মজাদার প্রশ্ন এবং উত্তরের জন্য মোদের নিজের ভাষা ছাড়া আর কোন গতি আছে কি? ■
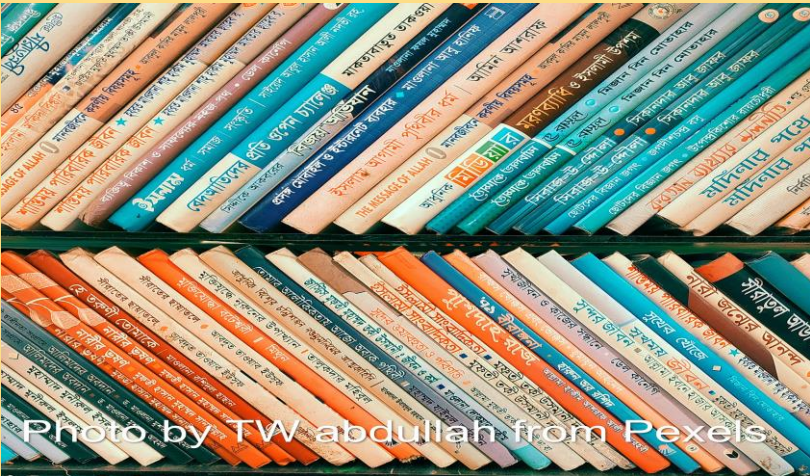
Photo by TW abdullah from Pexels

যেতে নাহি দিব

ডঃ বিশ্ব প্রসূন চ্যাটার্জি

লকডাউন শেষ, এবার আমার কর্মস্থল পুনেতে ফিরব। কলেজে ডেকে পাঠিয়েছে। এতোদিন মুম্বাইতে ছিলাম। আটমাস বাড়িতেই। আমার ছেলের জন্মের পর এতো দীর্ঘ সময় ওর সাথে কাটাইনি আগে। ওর জন্মের এক বছরের মধ্যেই আমি পুনেতে চাকরি পাই। তাই সপ্তাহের শেষে, আর ছুটিতে আসতাম। কিন্তু ছেলের সঙ্গে একটানা এতো সময় কখনই কাটাইনি। লকডাউনের আটমাস ওর সাথে খেলেছি, পড়িয়েছি। এবার লকডাউন শেষ, ফিরে যেতে হবে আমায়...

হঠাৎ ছেলে বলল, "বাবা, তুমি চলে যাবে? আর আসবে না?" ছেলে কাঁদছে, আমি কাঁদছি আর বউও কাঁদছে। কানে বাজতে লাগলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা — "যেতে নাহি দিব।"

অনেকেই প্রশ্ন করেন রবীন্দ্রনাথ কি প্রাসঙ্গিক আজকের দিনে? কিন্তু ২০২১-এও রবীন্দ্রনাথ সমানভবে প্রাসঙ্গিক। তাই আজও যখন বাবা ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফেরে তার পরিবারকে ছেড়ে, তখন কানে বাজে — "যেতে নাহি দিব।" ■

নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণঃ করণীয়

শামসুদ্দীন শিশির (বাংলাদেশ)

শহীদ দিবস থেকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য গৌরবের। যে কোনো জাতিগোষ্ঠীর কাছে নিজেদের মাতৃভাষা অত্যন্ত গর্বের ধন। বাংলা ভাষাভাষীদের পাশাপাশি আমাদের দেশে পঞ্চাশটিরও বেশি নৃ-গোষ্ঠী বাস করে। তাদের মাতৃভাষাও তাদের কাছে অনেক বেশি মর্যাদার স্বাক্ষর রাখে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় নৃগোষ্ঠী যেমন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তেমনি তাদের ভাষাও হারিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব ঐতিহ্য রক্ষায় দেশে দেশে নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণ এখন সময়ের দাবী। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠার দাবীতে শহীদ সালাম, রফিক, জব্বার ও শফিউরসহ সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল বরেণ্য ব্যক্তিত্বদের – যাঁদের সাংগঠনিক দক্ষতায় মাতৃভাষা আদায়ের দাবী জোরালো হয়েছে এবং দেশে বিদেশে গুরুত্ব পেয়েছে – বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের সবাইকে। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশের মানুষ শুধু মাতৃভাষা রক্ষার জন্য এত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

বৈচিত্র্যময় এদেশে নানান জাতির মানুষ বাস করেন। তাঁদের ভাষাও নানান রকম। এঁদের মধ্যে প্রধানত — চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, বম, খিয়াং, ম্রো, চাক, খুমী, পাংখোয়া, লুসাই, মনিপুরী, খাসিয়া, গারো, হাজং, পাঙন, সাঁওতাল ইত্যাদি নৃগোষ্ঠীরা উল্লেখযোগ্য। তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা থাকলেও এঁদের প্রায় সবাইকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে বাংলা শিখতে হয়। কারণ এঁদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, বাজার — সদাই, দেওয়া-নেওয়া প্রায় সবই বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে করতে হয়।

এছাড়া এও দেখা গেছে যে নিজেদের নিজস্ব ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও প্রায় বৃহৎ সংখ্যক বাঙালির দেশে বাস করতে গেলে, বাংলা ভাষার প্রভাব তো পড়বেই এটা খুবই স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় সাধারণত তিন ধরণের পরিবর্তন ঘটছে: উচ্চারণগত, শব্দভান্ডারগত এবং অনেকেরই নিজস্ব লিপি না থাকায় লোক সাহিত্য সীমিত হয়ে যাওয়া।

যাঁদের লিপি আছে তাঁরাও সেটি চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন না। যেমন চাকমাদের নিজস্ব লিপি আছে কিন্তু ৯৫ শতাংশই সেটি পড়তে ও লিখতে পারে না। এ কারণেই তাঁদের অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হচ্ছে বাংলা হরফে। অনলাইনেও তাঁরা বাংলা ও রোমান হরফে মাতৃভাষা চর্চা

করছেন। জাতিগোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষেরা মুখে মুখে যেসব গল্পগাথা ও লোকগান প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দিতেন, তার চর্চা দিন দিন কমে যাচ্ছে। (ভাষা বিজ্ঞানী অধ্যাপক সৌরভ সিকদার — প্রথম আলো)

২০১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে "২০২২-৩২ সময় কালকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী ভাষা দশক" হিসাবে পালনের জন্য আবেদন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নৃ-গোষ্ঠীর বিলুপ্ত-প্রায় ভাষা সংরক্ষণ। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিপন্ন ভাষাগুলোকে টিঁকিয়ে রাখা, তাঁদের সামাজিক-সাং-স্কৃতিক জীবনের স্বাতন্ত্র্যকে সমুন্নত রাখা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সবার ভাষিক অধিকার নিশ্চিত করা।

তাঁদের ভাষা সংরক্ষণের জন্য স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠন, স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণের জন্য স্ব স্ব ভাষায় অভিধান তৈরি করা, ভাষা সংরক্ষণ করার জন্য প্রত্যেক নৃগোষ্ঠীর ওপর পৃথকভাবে গবেষণা করা, যাঁদের নিজস্ব

লিপি নেই গবেষণা করে তাঁদের বর্ণমালা বের করা, ভাষার উৎপত্তি, বর্তমান অবস্থা, ক্রমবিকাশ, ভাষার ভবিষ্যৎ এবং ভাষাচর্চার মাধ্যমে কীভাবে ভাষাকে টিঁকিয়ে রাখা যায় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা – ইত্যাদি অতি প্রয়োজনীয়। তা ছাড়াও জরুরী – সেমিনারের আয়োজন করা, জার্নাল বা সাময়িকী প্রকাশ, বর্ণমালার বই প্রকাশ, স্বীয় সম্প্রদায় থেকে শিক্ষক নিয়োগ, নিজেদের ভাষায় রচিত বইয়ের ব্যবহার নিশ্চিত করা যাতে শিক্ষার্থীদের নিজ ভাষা শিখতে অনাগ্রহ না হয়।

শ্রেণী অনুযায়ী প্রতি বছর একটা করে পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং তার বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে হবে। উল্লেখিত উদ্যোগগুলো নিলে নৃ-গোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা সংরক্ষণ অনেকটা সহজ হবে। নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা সংরক্ষণে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সকলের আন্তরিকতা। ■

Photo by Nuruzzaman Akash from Pexels

প্রবন্ধ

বাংলার বর্ষার ইতিকথা

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

**“কুলায় কাঁপিছে কাতর কপোত, দাদুরী ডাকিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে।” (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)**

গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা দহনে নিসর্গ প্রকৃতি যখন দগ্ধ, নিরুদ্ধ-নিশ্বাস, আর তার তৃষ্ণাদীর্ণ বুকে যখন সুতীব্র হাহাকার; ঠিক তখনই ভৈরবী হরষে মেঘ-অম্বরে অবতীর্ণা হন **“ঘন গৌরবে নব যৌবনা বর্ষা রাণী।”** অরণ্যসহ গ্রাম-শহর-নগর ও প্রান্তরে জাগে শিহরণের স্পর্শ। দিকে দিকে ওড়ে তাঁর বিজয়-বৈজয়ন্তী। আকাশে দেখা যায় ধূসর পিঙ্গল কৃষ্ণঘন মেঘের সমারোহ। আর সাথে অবিরত শ্রাবণের ধারা আশীর্বাদের ন্যায় ঝরে পড়ে তপ্ত ভূমির বক্ষে। বর্ষা-কন্যার অঙ্গে সুসজ্জিত হয় কদম্ব-কেতকীর প্রাণবন্ত সুবাস।

শত শত যুগ ধরে বারিধারা শিল্পীকে দিয়েছে এক অনন্ত জগতের সন্ধান। আদি কবি বাল্মীকি তাঁর ‘রামায়ণ’ মহাকাব্যে **“অয়ং স কাল সমাগত”** বলে বর্ষার যে অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন, তা বর্ণনাতীত। বর্ষার এই স্নিগ্ধ-সজল মায়াময় ধারা যুগ যুগ ধরে কবি হৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার

করেছে। মহাকবি কালিদাসের দৃষ্টিতে ক্রীড়ারত হস্তীশাবকের ন্যায় আষাঢ়ের পুঞ্জ মেঘ পরিলক্ষিত হয়। কালিদাসের সেই বার্তাবাহী মেঘ আজও কবি ও পাঠক হৃদয়কে নিয়ে যায় সাহিত্য সৃষ্টির অলকাপুরীতে।

আবার জয়দেবের কাব্যে **"মেঘৈ-মেদুরম"**-এ বর্ষারই মৃদঙ্গ ধ্বনি শ্রুত হয়। বৈষ্ণব কবি সজল বর্ষার গম্ভীর পরিবেশে পেয়েছেন দুশ্চর সাধনার সংকেত। মৈথিল কোকিল বিদ্যাপতি তো শ্রীরাধাকে বর্ষা অভিসারী করে তুলেছেন, **"মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী/ ফাটি যাও ত ছাতিয়া।"** শ্রীরাধিকা **"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর"**-এর শূন্যতার মাঝে করেছেন অনন্তের সন্ধান। মঙ্গলকাব্যের কবিরা বর্ষার এক দুঃখময় চিত্র অঙ্কন করেছেন। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম লিখেছেন, **"আছুক শস্য হেজ্যা গেল।"** শুধু কাব্যে নয় সঙ্গীতেও বর্ষার এক আবেগপূর্ণ আবেদন রয়েছে। তাই কবিগুরুর লেখনীতে ফুটে ওঠে, **"শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা।"**

বর্ষা-প্রকৃতিকে নিয়ে রচিত হয়েছে ও আগামী দিনেও হবে কত গল্প, ছড়া, কবিতা, গান – তার ইয়ত্তা নেই। সেই জন্যই হয়তো বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন, **"বাঙালির শ্রেষ্ঠ কবিতা বর্ষার কাব্য, বর্ষাকে অবলম্বন করেই বাঙালির প্রেমের কবিতা।"** কারণ বর্ষার গহিনে যে রূপ, তার অন্তরের যে আকুতি – তা একজন কবি বা লেখক

ছন্দ, লয়, উপমা বৈচিত্র্যে উপস্থাপিত করেন।

বর্ষা সত্যিই ঋতুকুল রাণী সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে। তবে সেই বর্ষা রাণী আজ কোনো এক রূপকথার মতো বিশ্ব উষ্ণায়ণ নামক দৈত্যের কবলে বন্দি। সবুজ শ্যামল ঘেরা রাজকুমার বৃক্ষরাজিকে কারা যেন করেছে নির্বাসিত! এই সবুজ প্রকৃতির সাথে বারিধারার পুনরায় মিলন ঘটলে বিশ্ব মাঝারে ফিরবে শান্তি। তাই কবিগুরুর ভাষায়, “ **বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি** ।” ■

আমার ভাষা বাংলা ভাষা

প্রদীপ কুন্ডু

বাংলা আমার মাতৃভাষা
প্রথম শেখা বুলি,
বাংলা ভাষার গানেই আমি
মনেতে সুর তুলি।

বাংলা ভাষায় পড়ি লিখি
বাংলাতেই পাই শিক্ষা,
বাংলা ভাষায়. হয় যে আমার
পূর্ণ জীবন দীক্ষা।

মনের বাঁধন দেয় যে খুলে
আমার বাংলা ভাষা,
ইচ্ছাগুলোর প্রাপ্তি সুখে
জাগায় প্রাণে আশা।

দু'বেলার ওই অন্ন বস্ত্র
পাই যে ভাষার জন্য,
বাংলা ভাষায় আঁচল ছায়ায়
হয় যে জীবন ধন্য।

বাংলাকে তাই মা বলে যে
আমি সদাই ডাকি,
ভাষা ছাড়া জীবন আমার
ষোলো আনাই ফাঁকি। ■

প্রবন্ধ

বাঙালির তুমি ফুটবল

বিজয় নারায়ণ চৌধুরী

অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে শ্রদ্ধেয় ফুটবলার প্রদীপ ব্যানার্জি (পিকে) ও চুনী গোস্বামী আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন চিরকালের মত। দুজনেই আমাদের কাছে ফুটবলার হিসেবে হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন। এই ক্ষতি অপূরণীয়। আমাদের যৌবনে পিকে, চুনী, বলরামকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত তর্ক-বিতর্ক হত। বলরাম এখনো আমাদের মধ্যে আছেন। ছাত্র জীবনে এঁদের খেলা দেখার জন্য কি উন্মাদনাই না আমাদের মধ্যে ছিল, তখনই উপলব্ধি করেছিলাম বাঙালির কাছে ফুটবল খেলা দৈনন্দিন জীবনেরই অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা গোষ্ঠ পাল, শিবদাস ভাদুরী, বিজয় দাস ভাদুরীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁরা আমাদের কাছে অনেক দূরের মানুষ। তাঁদেরকে আমরা প্রণাম জানাই। কিন্তু পিকে, চুনী, বলরাম, কৃশানু, হাবিব ও আকবর আমাদের অন্তরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন।

ভাবতে আরম্ভ করলাম কিভাবে বাঙালির জীবনে ফুটবল খেলার আবির্ভাব ঘটলো, এটাতো বিদেশী। খেলার ইতিহাস খুঁজতে শুরু করলাম। পেয়েও গেলাম, পুরনো আনন্দবাজার পত্রিকার একটি লেখায়। সালটা ১৮৭৭, সেই সময় বড়লোকদের অনেকেই গাড়ি নিয়ে ময়দানে বেড়াতে যেতেন।

সেরকম একদিন একটি ৮ বছরের ছেলে গড়ের মাঠে আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে ফোর্ট-উইলিয়ামের পাশে ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাবের মাঠে গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে গাড়ি থেকে নেমে মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লো। হঠাৎ বলটি কোনো গোরাসৈন্যদের পায়ে লেগে ছেলেটির পায়ের কাছে এসে পড়লো, ছেলেটি ভয় না পেয়ে গোরাসৈন্যদের মত পা দিয়ে মেরে ফেরত পাঠিয়ে দিল। বাঙালির পায়ে এটাই প্রথম ফুটবল শট। ভারতেও প্রথম। এই ৮ বছর বয়সী ছেলেটির হাত ধরেই ফুটবল জগতে বাঙালির প্রবেশ। এই ছেলেটির নাম নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী। এই নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন হেয়ার স্কুলের ছাত্র। পরের দিনই একটা ফুটবল কিনে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে শুরু করলেন, কিন্তু তাঁরা এই খেলা কিভাবে খেলতে হয় জানতেন না। প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ব্রিটিশ প্রফেসর এঁদের আনাড়ি খেলা দেখে কিভাবে ফুটবল খেলতে হয় শিখিয়েছিলেন। বলতে গেলে এই প্রফেসরই ভারতের প্রথম ফুটবল কোচ। এভাবেই বাঙালির ফুটবল খেলা শুরু। নগেন্দ্রপ্রসাদ ছিলেন তখনকার আমলের ছেলেদের থেকে একটু অন্যধরনের, কিশোর বয়সেই তিনি গড়ে তোলেন কয়েকটি ফুটবল ক্লাব।

ভারতের প্রথম ফুটবল সংগঠন বয়েজ ক্লাব, তাঁর উৎসাহেই তৈরী। এর বেশ কয়েক বছর পরে নগেন্দ্রপ্রসাদ

তৈরি করেন শোভাবাজার ক্লাব। এই ক্লাবের মাধ্যমেই ফুটবল আস্তে আস্তে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় হতে থাকে।

ভারতে প্রথম ফুটবল প্রতিযোগিতা ট্রেডস কাপ। ১৮৮৯ সালে শোভাবাজার ক্লাব এতে অংশ গ্রহণ করে। বিদেশিদের কাছে হেরে গেলেও ফুটবল শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠার ইঙ্গিত বাঙালির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। ১৮৯২ সালে সব বাঙালি খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত শোভাবাজার ক্লাব খালি পায়ে খেলে নামকরা বিদেশি শক্তিশালী দল ইস্তসারেকে হারিয়ে দেয়। বাঙালিদের কাছে নায়ক হয়ে ওঠেন নগেন্দ্রপ্রসাদ ও তাঁর দলের খেলোয়াড়রা।

১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড জয়ের আগে ফুটবলে এটাই ছিল বাংলার সবচেয়ে বড় সাফল্য। ১৮৯২ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। তার একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। ১৮৯৩ সালে ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় 'শিল্ডের' খেলা শুরু হয়। তাতে একমাত্র ভারতীয় দল হিসেবে অংশ নেয় শোভাবাজার ক্লাব। নগেন্দ্র প্রসাদের হাতেই বাঙালির হৃদয়ে ফুটবল খেলার প্রদীপ জ্বলেছিল।

এরপর এলো মোহনবাগান ক্লাবের আলো। ১৮৮৯ সালে উত্তর কলকাতার মোহনবাগান লেনে তৈরি হয় মোহনবাগান ক্লাব। ১৯১১ সালে ইষ্ট ইয়র্কসায়র নামে বিদেশী দলকে

হারিয়ে ‘আই.এফ.এ. শিল্ড’ জয় করে মোহনবাগান। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। এই জয় ছিল বাঙালির কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনের মতো। সারা বাংলা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনেও এর প্রভাব পড়েছিল, ব্রিটিশদেরও যে হারানো যায় এ বিশ্বাস জন্মেছিল অনেকের মনে। তখন থেকেই এই খেলা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একটা বল হলেই হলো, বাইশ জনকে নিয়ে মাঠে নেমে পড়া যায়, ব্যয়ও অত্যন্ত কম। তখন সবাই খালি পায়ে খেলত। মোহনবাগান ক্লাব কোলকাতা লিগ জয় করে অনেক পরে ১৯৩৯ সালে। এর মধ্যেই বাংলার অনেক মানুষ মোহনবাগান ক্লাবের সমর্থক হয়ে পড়েন।

মোহনবাগান ক্লাব তৈরি হবার দুই বছর পর ১৮৯১ সালে কলকাতায় তৈরি হয় মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই ক্লাব তৈরি হওয়ার পর বাঙালিদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে মাতামাতি আরো বেড়ে যায়। মহামেডান স্পোর্টিংএর খেলা থাকলেই ক্লাব সমর্থকেরা পাগলের মতো খেলা দেখতে ময়দান-মুখী হত। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত মহামেডান স্পোর্টিং ভারতের এক নম্বর ক্লাব ছিল। বড় বড় প্লেয়াররা সারা ভারতবর্ষ থেকে এই ক্লাবে খেলতে আসতেন। তাজ মহম্মদ, ওসমান জান, আব্বাস মির্জা, জুম্মা খাঁর নাম মুখে মুখে ফিরত। মহামেডান ক্লাবই একটানা পাঁচবার শিল্ড জেতে ভারতীয় দলগুলির মধ্যে প্রথম। কলকাতা

লিগও তারা প্রথম জেতে ১৯৩৪ সালে।

কলকাতার শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম ১৯২০ সালে। প্রথমে তাঁরা দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে খেলতে শুরু করেন। এই ক্লাবের সব প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন পূর্ব বঙ্গের, যদিও কলকাতায় তৈরি হয়েছিল এই ক্লাব। এই কারণেই এই ক্লাবের নাম রাখা হয় ইস্টবেঙ্গল। ১৯২৫ সালে দ্বিতীয় ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়ে, নানা বাধা-বিপত্তি পার হয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রথম ডিভিশনে খেলার সুযোগ পায়। এই ক্লাবের নাম পূর্ব বঙ্গের নামে হওয়ায় পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ মানুষই এই ক্লাবের সমর্থক হয়ে পড়েন। ইস্টবেঙ্গল প্রথম লীগ জেতে ১৯৪২ সালে, শিল্ড জেতে ১৯৪৩ সালে। মোহনবাগান, মহামেডান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এদের খেলা দেখার জন্য ক্লাব সমর্থকদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ দেখা যেত। সবাই ময়দানমুখী হতো ঝড়-জল উপেক্ষা করেই। কোনো বাধাই তাদের কাছে বাধা মনে হতো না। ইস্টবেঙ্গল টিমের ভেঙ্কটেশ, আপ্পারাও, ধনরাজ, আমেদ খান ও সালেকে বলা হতো পঞ্চপান্ডব। এঁদের জন্য ইস্টবেঙ্গল ১৯৪৩-১৯৫৩-র মধ্যে লীগ, শিল্ড, রোভারস, ডুরানড এবং ডি.সি.এম কাপ জেতে। এটা একটা রেকর্ড। ১৯৪৮ সালে মোহনবাগান ক্লাবের প্লেয়ার টি. রাওয়ের নেতৃত্বে ভারত প্রথম লন্ডনে অলিম্পিকস খেলতে যায়। সেই টিমে শৈলেন মান্নাও ছিলেন। তাঁরা ভাল খেলেও ফ্রান্সের

কাছে ২-১ গোলে হেরে যান। ভারতের প্লেয়ারদের খালি পায়ে খেলা দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছিল। হাসতে হাসতে টি. রাও সাংবাদিকদের বলেছিলেন, “সব দল বুটবল খেলে আমরাই একমাত্র ফুটবল খেলি।” এই কথা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

অনেক নামী প্লেয়ার এই ক্লাবগুলিতে খেলে গেছেন। কিন্তু চুনি, বলরাম, হাবিব, আকবর পরবর্তীতে কৃশানু-বিকাশ জুটি সমর্থকদের হৃদয়ে রয়ে গেছেন। অতি অল্প বয়সে আমরা কৃশানুকে হারিয়েছি। এটা ভাবলেই মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। চোখের উপরে ভেসে ওঠে তাঁর অতুলনীয় ক্রীড়া দক্ষতা। বিদেশি প্লেয়ারদের মধ্যে চিমা ওকেরি, ওমেলো, এমেকা, ব্যারেটো ও আরো অনেক প্লেয়ার খেলে গেছেন। কিন্তু বেশিরভাগ দর্শকের কাছে মজিদ বাস্কর ও জামশেদ নাসিরিই সবার উপরে। এদের সবার খেলা দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে, এটাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ পাওয়া।

আবার ফিরে আসি যাদের নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম, আমাদের কাছে চুনি মানেই মোহনবাগান, বলরাম মানেই ইস্টবেঙ্গল আর পিকে মানেই ইস্টার্ন রেল। চুনি ছিলেন খেলার জগতের নায়ক, মাঠ ও মাঠের বাইরে তাঁর চলাফেরা ছিল নায়কোচিত। মাঠে তাঁর ড্রিবলিং, পাসিং, শুটিং-এর মধ্যেও ছিল মাধুর্য অন্যদের থেকে একদম আলাদা। প্রদীপ

ব্যানার্জি কোনদিন কোন বড় ক্লাবের হয়ে খেলেননি। কিন্তু নিজের অসাধারণ প্রতিভায় সবসময় ভারতীয় দলে অপরিহার্য ছিলেন। চুনী, পিকে, বলরামকে বাদ দিয়ে তখন কোন টিম ভাবা যেত না। চুনী ছিলেন ১৯৬২ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক আবার ১৯৬০ সালে অলিম্পিকসে ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন প্রদীপ ব্যানার্জি।

চুনী ছিলেন ক্রিড়া জগতে অলরাউন্ডার, তিনি ফুটবল ও ক্রিকেটে বাংলাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই কৃতিত্ব আর কারো নেই। তিনি লন্ টেনিসও খুব ভালো খেলতেন। আবার প্রদীপ ব্যানার্জি প্লেয়ার হিসেবে যেমন শ্রেষ্ঠর দলে তেমনি কোচিংএও। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে কোচিং করে সফলতার শিখরে তুলে দিয়েছিলেন তিনি। রহিম সাহেবের পর এত বড় ফুটবল কোচ ভারতে আর জন্মাননি। খেলা ও কোচিংএ পিকে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চুনি ও প্রদীপ ব্যানার্জীর স্থান আর কোনদিন পূরণ হবে বলে মনে হয় না। তাঁরা থেকে যাবেন আমাদের অন্তরে।

বন্ধুদের সঙ্গে মাঠে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়া খেয়ে টিকিট কেটে কাঠের গ্যালারিতে বসে প্রিয় ক্লাবের খেলা দেখার আনন্দই আলাদা। বর্তমানে টিভিতে খেলা দেখি, কিন্তু মাঠের সেই আনন্দের খেলা দেখা আজও ভুলতে পারিনা। মাঠে গিয়ে প্রিয় প্লেয়ারদের খেলা

দেখতে পেরেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কোন খেলার কথা ভাবলেই, মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখার ছবি চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নতুন প্রজন্মকে আর কাঠের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখতে হয় না, টিকিট কাটতে গিয়ে লাইনে ঘোড়সওয়ার পুলিশের তাড়াও খেতে হয় না। কলকাতায় তৈরি হয়েছে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন। নানা শহরে তৈরি হয়েছে স্টেডিয়াম। নবীন দর্শকদের কাছে আবার তাঁদের প্রিয় নতুন নতুন প্লেয়ার তৈরি হবেন। তাঁরাও আবার তাঁদের প্রিয় ক্লাবের খেলোয়াড়দের নিয়ে মাতামাতি করবেন। খেলা দেখার জন্য স্টেডিয়াম ভরিয়ে তুলবেন। প্রিয় দলের সমর্থনে চিৎকার করবেন, প্রিয় প্লেয়ার নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বিতর্ক হবে। এটাই বাঙালির ক্রীড়া জগতের প্রবাহমান ছবি। এটা চলতে থাকবে, এই কারণেই স্বর্গীয় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গানটি মাথায় রেখে এই লেখার নাম দিয়েছি— “সব খেলার সেরা **বাঙালির তুমি ফুটবল**।” ■

Photo by Markus Spiske from Pexels

প্রবন্ধ

বাংলার হকি নৈরাশ্যের আঁধারে ক্ষীণ আশার আলোর উঁকি

সুজন ভট্টাচার্য

'২০২১ টোকিও অলিম্পিক গেমস' আয়োজক কমিটির সভাপতি ইওশিরো মোরি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে করোনা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, পুনঃনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী ২৪শে জুলাই থেকে ৯ই আগস্ট টোকিওতেই গেমস হচ্ছে। তবে সর্বশেষ বৈঠক অনুসারে নির্ভরযোগ্য সুত্রের দাবি যে এ নিয়ে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

ইতিমধ্যে অলিম্পিক গেমসের সম্ভাবনা নিয়ে সর্বভারতীয় হকি মহলে এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার ভাব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ভারতীয় মহিলা হকি দলের ১৭ই জানুয়ারি থেকে আট ম্যাচের আর্জেন্টিনা সফর অলিম্পিকের প্রস্তুতিরই এক অঙ্গ বলা যেতে পারে। এদিকে বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত জাতীয় পুরুষ হকি দলের প্রস্তুতি শিবিরও শুরু হয়ে গেল ৫ই জানুয়ারী থেকে।

অলিম্পিক-প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে নূতনভাবে জেগে ওঠা এই প্রাণোচ্ছ্বাসের প্রেক্ষাপটে এবং সর্বভারতীয় হকির

স্পন্দনের নিরিখে বাংলার হকির অবস্থানটা ঠিক কোথায় এবং কেমন?

একদা সর্বভারতীয় স্তরে অজস্র খেলোয়াড় উপহার দেবার সুবাদে বাংলাই ছিল জাতীয় পুরুষ হকি দলের মেরুদণ্ড এবং অহঙ্কার। কিন্তু কয়েক দশকের পর আজ জাতীয় স্তরে যোগ্যতা ও প্রদর্শনের মানদণ্ডে বাংলার হকি ঠেকে গিয়েছে একেবারে তলানিতে।

জাতীয় তথা বিশ্ব হকিকে বাংলার উপহার স্বরূপ, ঐতিহাসিক 'বেটন কাপ (Beighton Cup)' সুদীর্ঘ ১২৬ বছরের গৌরব আজও বাংলার বুকে বহন করে চলেছে। কলকাতার মাটিতে সর্বপ্রথম ১৮৯৫ সালে আয়োজিত এই 'কাপ' ভারতের প্রাচীনতম এবং বিশ্বের অন্যতম প্রাচীনতম আনুষ্ঠানিক হকি টুর্নামেন্ট।

তাছাড়া দেশকে উপহার দেওয়া আরও বহু 'প্রথম'-এর গৌরবে কলকাতা চিরকাল গৌরবান্বিত হয়ে থাকবে। ১৯০৮ সালে কলকাতায় স্থাপিত বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশন (Bengal Hockey Association বা B.H.A.) হল ভারতের সর্বপ্রথম হকি অ্যাসোসিয়েশন। আর জাতীয় স্তরের সর্বপ্রথম হকি টুর্নামেন্টও হয় কলকাতারই মাটিতে ১৯২৮ সালে। আবার ঠিক তারপরেই এই মহানগরীতেই অনুষ্ঠিত হয় সর্বভারতীয় হকি দলের প্রথম অলিম্পিক যাত্রার সূচনা।

ভারতের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত যে ভূমিকে জাতীয় হকির

আঁতুরঘর এবং সর্বোচ্চমানের গৌরবময় ইতিহাস বহনকারী বললেও বোধকরি বেশী বলা হয় না, সেই বাংলার হকির এমন দারিদ্র ও দুর্দশার সঠিক ব্যাখ্যা কজন দিতে পারে?

রাজ্যের তথা এই দেশের বহু স্বনামধন্য হকি তারকার মন্তব্যনুযায়ী বাংলার হকির এই ক্রমে ক্রমে অধঃপতন যা আজ প্রায় বিলুপ্তির পথে তার জন্য যে ক'টা প্রধান কারণ রয়েছে তাহলো – অ্যাস্ট্রো-টার্ফ যুক্ত হকির জন্য নিবেদিত মাঠ সহ কতকগুলি উপযুক্ত আধুনিক পরিকাঠামোর অভাব, স্থানীয় ক্লাবগুলির মাত্রাতিরিক্ত অনাগ্রহ এবং স্পন্সরশিপের বিশেষ অভাব, এবং তারই সাথে গড়ে ওঠা শিশু এবং কিশোর খেলোয়াড়দের অভিভাবকদের তথা সামগ্রিক সমাজের হকি বিমুখ মানসিকতা।

বাংলার হকির এই হতাশার আঁধারে এবং নৈরাশ্যের চিত্রপটে সম্প্রতি আচমকাই এক আশার ক্ষীন আলোর উঁকি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য তথা কলকাতা মহানগরী শীঘ্রই তিন একর জমিতে অ্যাস্ট্রো-টার্ফ-সুসজ্জিত এক আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়াম পেতে চলেছে। আনুমানিক ২০.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে নির্মিত এই স্টেডিয়াম ৬,৫০০ দর্শককে আসন দিতে সক্ষম হবে। ■

Photo by Skylar Kang from Pexels

আমার ভাষা

সামিমা খাতুন

দিন থেকে সন্ধ্যা, রাতে,
খাওয়া, ঘুমের মতো,
বাংলা ভাষা থাকে সাথে,
অন্য ভাষা থাক যতো।

হঠাৎ করে মনের খেয়ালে,
শব্দ যখন খেলা করে,
কিংবা যখন সেজে চলে,
ভাষা অন্য হয় না ভুল করে।

বাংলা ভাষা মিষ্টি এতো,
নামি মিষ্টি হার মানায়,
জমা অনুভূতি হোক প্রকাশিত,
মায়া জড়ানো প্রাণের ভাষায়।■

বাংলা ভাষাকে বাঁচাও

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

বাংলা ভাষার দুই মহান দিকপাল শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সুকুমার সেন মহাশয়ের বক্তব্য অনুযায়ী আনুমানিক খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে এই ভাষার উৎপত্তি। আবার বাঙালি সুপণ্ডিত জনাব মুহম্মদ শহীদুল্লাহের গবেষণা থেকে জানা যায় যে ভাষাটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতেই জন্ম লাভ করে। উৎপত্তির সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও বিগত পাঁচশো বছর ধরে যে এই ভাষা বৃহত্তর ভারত এবং পৃথিবীর অন্যান্য কিছু দেশেও চলে আসছে, সে তথ্য সর্বজনজ্ঞাত।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, #এথনোলগের ২০০৫ সালের গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, পুরো বিশ্বে ব্যবহৃত ৩০ টি প্রধান ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা রয়েছে সপ্তম স্থানে, এবং সর্বসাকুল্যে দুনিয়ার ২৩০ মিলিয়ন ব্যক্তি এই ভাষাটি ব্যবহার করেন – যার মধ্যে ১৯৬ মিলিয়ন মানুষের এইটিই হল মাতৃভাষা।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতের সংবিধান স্বীকৃত একটি ভাষা হওয়া ছাড়াও,

বাংলা সুদূর পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগরের উপকূলবর্তী একটি দেশ সিয়েরা লিওন-এর অন্যতম সরকারি ভাষা।

***Top 30 Languages by Number of Native Speakers**

Data source: Ethnologue: Languages of the World, 15th ed. (2005)

Serial No.	**Language**	**Approximate No. of Speakers**	**Where is it spoken as the official language?**
7.	Bengali	NATIVE: 196 million TOTAL: 215 million	OFFICIAL: Bangladesh, India (Tripura, West Bengal)

* Abridged to save space...

Source of the complete statement: https://www.vistawide.com/languages/top_30_languages.htm

২০১০ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) বাংলা ভাষাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা হিসাবে পরিগণিত করেছে। বাংলা ভাষা এত মিষ্টি কেন? এর উত্তর হিসাবে বলা যেতে পারেঃ ১) বাংলা ভাষা খুব সহজেই বলতে এবং আয়ত্ত করতে পারা যায় তার কারণ এর ব্যাকরণ অতি সহজ। সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন অন্যান্য অনেক ভাষার মত এই ভাষাটিতে ‘লিঙ্গ’ বা ‘কাল’ নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়নি, যার ফলে ব্যবহারের সময় অত সজাগতার প্রয়োজন হয়না। ২) এই ভাষার শব্দগুলির মধ্যে বন্ধুরতা

বা রূঢ়তা তেমন নেই বললেই চলে। এর স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণগুলি অতি সহজেই সবার দ্বারা উচ্চারণ করা সম্ভব হয়। ৩) বাংলার শব্দভাণ্ডার অতিশয় সমৃদ্ধ, তাই ভাব প্রকাশের জন্য লেখক বা বক্তাকে বেশি বেগ পেতে হয়না। ৪) শেষ কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার এই ভাষা প্রসঙ্গে বলতে হয় – যা হল এই ভাষার উচ্চারণ রীতি। ব্যঞ্জনে 'অ' যুক্ত হওয়ায় প্রতিটি শব্দই একপ্রকার কাব্য-মাধুর্যের সৃষ্টি করে।

সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাথে বাংলার এই বৈষম্যকে লক্ষ্য করেই বোধ করি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী প্রমথ চৌধুরী (বীরবল) লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষা আর্য ভাষা নয়, উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা – এক কথায় একটি নবশাখা ভাষা।"

২০১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে হিন্দীর পরেই ভারতের জনগণ যে ভাষাটিকে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেন তার নাম 'বাংলা'**।

STATEMENT**

Scheduled Languages in Descending Order of Speakers' Strength – 2011

S. No.	Language	Persons who returned the language as their mother tongue	Percentage to total population
1	Hindi	52,83,47,193	43.63
**2	Bengali	9,72,37,669	8.03

* Abridged to save space...
Source of the complete statement:
http://censusindia.gov.in/2011Census/C-16_25062018_NEW.pdf

আমরা জন্মসূত্রে এই সুন্দর ভাষাটির উত্তরসূরি, কিন্তু এই মুহূর্তে একটি প্রশ্ন আমাদের অনেক চিন্তাবিদদের কাছেই দণ্ডায়মান তা হল এই ভাষার ভবিষ্যৎ কি? যদিও ইউনেস্কোর তথ্য অনুযায়ী যে ভাষা ১০,০০০ জনেরও কম ব্যক্তি ব্যবহার করেন, সে ভাষার বিলুপ্তির সম্ভাবনা প্রবল – তাই বাংলা ভাষা এখনও সেই রকম কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি, তবুও রবীন্দ্রোত্তর যুগে এই ভাষার দ্রুত অবক্ষয় নিঃসন্দেহে একটি বৃহৎ চিন্তার কারণ বৈকি।

এই অবনমন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই, যা আজ অতিশয় ত্বরিত। শ্রী প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভাষায়, “আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমত ওরূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, দ্বিতীয়ত সম্ভব হলেও বড়ো বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? ওতো খাদ নয়, ঐ তো হচ্ছে বাঙালি জাতির মূলধাতু। এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিংবা উপেক্ষা করবার জিনিস নয়, তা যিনিই বাঙালির প্রাচীন ইতিহাসের সাধন রাখেন তিনিই মানেন।”

আহ্বান

পালটেছে যুগ, বিংশ শতাব্দীর বাংলা ভাষায় যেমন ইংরাজীর প্রভাব অতি স্পষ্ট, ঠিক তেমনই আজকের বাংলা ভাষায় হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় বা পাশ্চাত্য ভাষার শব্দ এবং ভাবভঙ্গীর আপনায়নের চেষ্টা সুস্পষ্ট। নব্য প্রজন্মের মধ্যে এই প্রবণতা মাত্রাতিরিক্ত, যার ফলে বহুলাংশে বাংলা ভাষার মৌলিকত্ব অত্যন্ত দ্রুত এবং কদর্যভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা নতুন কোন তত্ত্বের ক্ষেত্রে হয়ত সব শব্দের প্রতিশব্দ তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়না, তাই কিছু ভিনদেশী শব্দ সাময়িক ভাবে গ্রহণ করতে আমরা বাধ্য, কিন্তু তাই বলে সরল সুবোধ বাংলা ভাষার শব্দগুলিকে অহেতুকভাবে বিসর্জন দিয়ে সেই স্থান অন্যভাষার শব্দ দিয়ে পূরণ করার যে উদ্দম প্রয়াস আজ চলছে তা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায়না।

এই প্রসঙ্গে সরকারি উদ্যোগের চেয়েও বেশি প্রয়োজন স্বদেশী ও বিদেশী প্রতিটি বাঙলাভাষী পরিবারের আন্তরিক এবং সজাগ প্রয়াস। প্রতিটি শিশুকে শেখান উচিত – যখন বাংলা বলবে বা লিখবে প্রতিটি শব্দ যেন বাংলার হয়। যদি ভাব প্রকাশে অসুবিধা হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই শব্দটির বাংলা সমস্থানিক শব্দটি আয়ত্ত করার প্রয়াস নাও। আর উচ্চারণে বাংলার মাধুর্য বজায় রাখার চেষ্টা কর। ভিনদেশি ভাষার নকলে বাংলা ব্যাঞ্জন বর্ণকে টুকরো করে উচ্চারণ কর না। বাঙ্গালির ভাবে বাঙ্গালির ঢঙ্গে বাংলা বলো এবং লেখো। **আন্তর্জাতিক** মাতৃ**ভাষা দিবসে এই হোক আমাদের আন্তরিক সংকল্প।** ■

কবিতা

বাংলা ভাষা

প্রণব কুমার বসু

ভাষার জন্য প্রাণ দিতে চায় যে জনগণ
ভাষার জন্য লড়াই করে মরণ-বাঁচন।
ভাষার জন্য যায় যদি যাক নিজের প্রাণ
লড়াই করে এগিয়ে যাব - গাইব গান।

যে ভাষাতে বিশ্ব জেতে রবি - নজরুল
সেই ভাষা-কেই এগিয়ে দেয় ববি - ইনামুল।
আসুক বাঁধা - ছিনিয়ে নেওয়া রক্ত দিয়ে
জিতে আমরা আসব ফিরে - দেবো দেখিয়ে...

বাহান্ন সালের ফেব্রুয়ারিতে যা হয়েছে শুরু
ভয়ে পেয়েছে রাষ্ট্রগুরু - কেঁপেছে ভুরু।
ভাষার লড়াইয়ে একুশে যাঁরা দিয়েছেন প্রাণ
বাংলা তাঁদের করে প্রণাম - তাঁরা যে মহান।।■

Photo by Evelina Zhu from Pexels

অণু-চিন্তন

মাতৃভাষা

পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস

ভাষাবিদরা কতটা সম্মতি দেবেন জানিনা, তবে আমার মনে হয় – বাংলা ভাষা এমন একটি ভাষা যার শব্দগুলির আবেদন অভ্যস্ত বাঙালির কান ছাড়িয়েও, অন্তত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের অবাঙালি মানুষদের কাছে কিছুটা হলেও বোধগম্য। অনেকে হয়ত বিতর্ক জুড়তে পারেন এই বলে যে – ভারতের প্রায় সবকটি প্রধান ভাষাই সংস্কৃত থেকে আসায়, ওইসব ভাষাভাষী লোকেরা কিছুটা হলেও একে অপরের ভাষা বুঝে নেবেন – এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

সত্যিই কি তাই! তাই যদি হত, তাহলে কলকাতায় বা বাংলার অন্যান্য জায়গায় বসবাসকারী অন্য রাজ্যের বাসিন্দাদের ভাষা আমরা কি খুব ভালভাবে বুঝতে পারি? ব্যাপারটা বিতর্কিত, আর তাছাড়া বোধ হয় খানিকটা অভ্যাসের ওপরও নির্ভর করে। যা হোক, কথা শুরু করেছিলাম, বাংলা ভাষা নিয়ে, সেখানেই ফিরে আসি এবার। চাকরি জীবনে স্থায়ীভাবে বাংলার বাইরে না থাকলেও প্রায়শই কাজের খাতিরে অন্যান্য রাজ্যে যেতে হত, এমনই একবারের একটি ঘটনা আজ বলব – যা থেকে

অণু-চিন্তন

পাঠকেরা নিজেরাই অনুমান করতে পারবেন বাংলা ভাষা অবাঙালিদের কাছে কতটা সহজে বোধগম্য, এবং বোধকরি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের সুকর্মফলের সুবাদে আজও ভারতের অন্য প্রদেশে আমারা কতটা জনপ্রিয়...

কর্মজীবনের সূর্য তখন ঢলতে শুরু করেছে। সেদিনটাও ছিল ২১ শে ফেব্রুয়ারী। সকালে স্থানীয় পরিবহন যানে চলেছি পানিপথ থেকে ঝিন্দে। তিন চাকার অদ্ভুত সে যান, ত্রিপল দিয়ে আষ্টে পৃষ্ঠে মোড়া। মাঝপথে উঠেছি কাজেই এক প্রকার চেপেচুপে দরজার পাশেই বসতে হলো। মনে হচ্ছে আমিই বুঝি ঝিন্দের বন্দী। শীতের সকালে গাড়ি হু-হু করে ছুটে চলেছে, ত্রিপলের ফাঁক দিয়ে তীরের বেগে ঠান্ডা হাওয়া শরীরকে বিদ্ধ করছে, ঠান্ডায় হাত জোড়া দু বগলের তলায় স্থান করে নিয়েছে।

পথিমধ্যে গতি কমিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। উঁকি দিয়ে দেখলাম রাস্তায় এক অশীতিপর বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। মুখের প্রগাঢ় বলি রেখা তাঁর বয়সের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি স্থানীয় ভাষায় কিছু একটা বলে যাচ্ছিলেন, যা আমার কর্নকুহরে প্রবেশ করলেও মস্তিস্ক নামক কম্পিউটার তার মানে উদ্ধার করতে পারছিলো না।

আমার পাশে বসা এক জোড়া সহযাত্রীনি লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে বৃদ্ধাকে এক প্রকার পাঁজা কোলা করে গাড়িতে তুলে নিলেন। গাড়ি কুয়াশা ভেদ করে ছুটে চলেছে

আবার। আর ভিতরে আমার দিকে তাকিয়ে এবং আমাকে উদ্দেশ্য করে চলেছে ভাষার বর্ষণ। যদিও সে ভাষার মানে উদ্ধার করার সফটওয়ার আমার মস্তিস্ক নামক কম্পিউটারের ভিতর ছিলনা, তবুও অনুমান করতে পারলাম – বৃদ্ধা গাড়িতে তাঁকে তুলে নেবার জন্য আমাকে তাঁর মাতৃভাষায় অনুরোধ করেছিলেন, যা আমার বোধগম্য হয়নি। তাই এই অকৃতজ্ঞ বঙ্গ সন্তানের মুন্ডপাত চলছে।

আমার কোন প্রত্যুত্তর নেই দেখে বা আমি বধির কিনা তা পরখ করার জন্য পাশে বসা সহযাত্রীনি আমাকে এক প্রকার জোরে ধাক্কা দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেন। হাত জোর করে প্রথমেই আধা হিন্দি আর আমার প্রাণের ভাষা মিশিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, আমি পরদেশী তোমাদের ভাষা বুঝতে পারছি না, আমায় ক্ষমা করো। ম্যাজিকের মতো কাজ হলো তাতে।

এবার হিন্দিতে সহযাত্রীনি জানতে চাইলেন আমার আগমন এবং গন্তব্য স্থল। কোন রকম ভনিতা না করে আরো নমনীয় করে মাতৃ ভাষায় বললাম এসেছি বাংলা মুলুক থেকে যাবো ঝিন্দে। আমার কি কাজ সব জানতে চাইলেন, তাও বললাম। এবার তিনি আমার মাতৃভাষার সাথে তাঁদের মাতৃভাষার যোগসূত্র খুঁজে খুঁজে আমার সাথে গল্প জমালেন। এক সময় এক সহযাত্রী বললেন, "তোমাদের ভাষাটি বেশ মিষ্টি", আমি গর্বিত অনুভব করলাম আমার মাতৃভাষার জন্য।

অণু-চিন্তন

মনে হল, আজ এই মরুভূমির দেশে ২১ শে ফেব্রুয়ারী ক্যালেন্ডারের পাতায় নিছকই একটা তারিখ। ভাবলাম, “মোরা সেই ভাষাতেই করি গান...” গন্তব্যে পৌঁছে সহযাত্রীনিদের বিদায় জানিয়ে পৌঁছে গেলাম আমার কর্মস্থলে।

তারপর কেটে গেছে অনেক সময়, তবু আজও যখন মনে পড়ে সেদিনের ঘটনা – কানে বাজে, “তোমাদের ভাষাটি বেশ মিষ্টি...” ■

আলোকচিত্রঃ শক্তিগড়ের ল্যাংচা...
চিত্রগ্রাহকঃ বিশ্বরূপ গাঙ্গুলি
Source:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langcha_-_Saktigarh_2014-06-29_5576.JPG

প্রবন্ধ

আসফাক উল্লার ভোর ও আলোর গল্পমালারা

দেবাশিস চক্রবর্তী

ওই মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কোন সঙ্গীত ভেসে আসে... আর ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে বহু পথ ও মত ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের মতই বার বার ভেসে এসেছে। এখন প্রশ্ন হল, ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসের শুরুটা আমরা কবে থেকে ধরবো? আরও মজার প্রশ্ন হল বেদের যুগেও কী রাজনীতি ছিল না? সেই রাজনীতির ধারাও কী ভারতীয় ইতিহাসের ধারা নয়? ফলে প্রশ্নটা থেকেই যায়। আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাগুলো কী কী? এবং তার সঙ্গে প্রাক আধুনিক ইতিহাসের সংযোগই বা কী? যাই হোক, বেদ দিয়ে যখন শুরু করেছি তখন বলেই ফেলি যে, সেই বেদের যুগেও যাগযজ্ঞ, ঈশ্বর ইত্যাদিকে চ্যালেঞ্জ করে চার্বাকদের জন্ম হয়েছিল। যারা মনে করতো পৃথিবীতে মানুষ একবারই আসে। কোনও পরজন্ম বলে কিছু হয় না। সুতরাং প্রতিটা মানুষকেই তার ইহজন্মেই সুখী হওয়া উচিত। আর এখান থেকেই মনে হয় ভারতীয় রাজনীতির ধারাগুলো সম্পর্কে একটা পরিস্কার ধারণা হয়তো পাওয়া যায়।

আর এই ধারণাই বলে যে, একদিকে যদি বেদ থাকে তাহলে অন্যদিকে তাকে চ্যালেঞ্জ করে আরও বেশি মাত্রায় মানব মুক্তির এক উন্নততর ধারণাও থাকবে। শুধু চার্বাকই নয় কপিলের দর্শনেও কোনও দৈব পুরুষ এই মহা পৃথিবী তৈরি করেছেন, এই থিওরি বাতিল হয়ে যায়। কপিলের সাফ কথা গতির নিজের নিয়মে এই মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। এই মহা ব্রহ্মান্ড জুড়ে চলছে পুরুষ ও প্রকৃতির খেলা। অর্থাৎ আজ রাজনীতিতে যে বিষয়গুলো উঠে আসছে – পরিবেশ রক্ষা করা থেকে শুরু হয়ে ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব অধিকারগুলোকে আরও বেশি মাত্রায় সংগঠিত করা। তারই এক উপস্থাপনার সে যুগের সন্ধান যেন দিচ্ছেন কপিল। বেদ যখন রাষ্ট্র যুদ্ধ এসব নিয়ে ভাবছে। সে সময়ই হয়তো কপিল চলে গিয়েছেন রাষ্ট্রহীন সমাজের এক কনসেপ্টএ, যেখানে রাষ্ট্র নয়, মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে ভাবছেন কপিল। হয়তো রাষ্ট্রহীন এক সমাজের কথা ভাবছেন কপিল। তাই হয়তো পরবর্তী কালে আমরা দেখি গান্ধীজীর চিন্তায় রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের কথা অনেক অনেক বেশি উঠে আসছে। স্বাধীনতার পর গান্ধী চাইছিলেন না যে কংগ্রেস দলটাই থাকুক, শক্তিশালী সেনা থাকুক, তার বদলে তিনি সমাজকে উন্নত করার ওপর গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন। তিনি চাইতেন প্রতিটা আঁখি কোণ থেকে কান্না মুছিয়ে দিতে। ফলে সেই আবার যেন কপিলের সেই সুর ফিরে ফিরে আসছে। যা

হয়তো বলে আসল কথা শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরি করা নয়। আসল কথা হল সুন্দর জীবনকে ভাষা দেওয়া।

আবার খুব সংগত কারণেই গান্ধীবাদের আপোষমুখী বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আম্বেদকার বা নেতাজীর ধারণায় স্টেট প্রবল গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু সে গুরুত্ব হল বাড়ির ভেতরে প্রবেশের জন্য দরজার যেমন গুরুত্ব থাকে ঠিক তেমনি। আমূল ভূমি সংস্কার সহ শ্রমিকদের জীবন জীবিকার উন্নতি আর জাতপাতের অবলুপ্তি। সেকুলার ভারতবর্ষ নির্মাণ। এই দাবিগুলো পুরণের জন্যই সুভাষ বোস বা আম্বেদকার এক নতুন ধরণের আধুনিক রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। অর্থাৎ চার্বাকদের সময় থেকেই ভারতের ইন্টালিজেনসিয়া যে নতুন পথের সন্ধান করেছিল, তারই হয়তো এক তীব্র আধুনিক রূপ ছিল আম্বেদকার বা নেতাজীর রাজনীতি। সুতরাং ভারতীয় রাজনীতির এক তীব্র রূপ হল বধ্যাবস্থা নয়, বরং আরও আলো ও আধুনিকতার সন্ধানকে বাঙময় করে তোলা।

এই আলোর গল্পকে হয়তো বোঝাই যাবে না। ভারতীয় কমিউনিস্টদের মাইনাস করে। নজরুল তাঁর ব্যথার দান উপন্যাসে দেখান কী ভাবে লাল ফৌজের হয়ে লড়তে চলে যায় বাঙালি যুবকরা। ভিকাজি রুস্তম কামার মত বিপ্লবী চিৎকার করে বলেন, “নাও অল রোডস গোয়িং টুয়ার্ডস রাশিয়া।” ফলে এখান থেকেই মনে হয় বোঝা যায় যে রুশ

বিপ্লব কী গভীর ছায়াই না বিস্তার করেছিল ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। আজকের অনেক তথাকথিত কমিউনিস্ট বলতেই ভুলে যান যে প্রথম স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল কংগ্রেস নয় ভারতীয় কমিউনিস্টরা।

তবে এই আলোর গল্পের ওপিঠে অন্ধকারও আছে। অবশ্য আলো থাকলে অন্ধকারও থাকবে তা নিশ্চিত। সেদিন যদি নেতাজীর সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারতেন, তবে হয়তো দেশ ভাগ হত না। ভারতীয় উপমহাদেশের চেহারা আজকের মত হতো না।

আর সেদিনও ভারতীয় রাজনীতির সাম্প্রদায়িক কারবারীরা মুসলিম লিগ ও তথাকথিত হিন্দুত্ববাদীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে পার্টিসিপেটই করেনি। ওই রাজনৈতিক ধারাগুলো ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে অনুগত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেরই অন্য নাম।

যাই হোক এ লেখা শেষ করি ভারতীয় বিপ্লবের অন্যতম এক ধারা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসীদের কথা বলে, ফাঁসির আগে নিজের মাকে লেখা চিঠিতে বিপ্লবী আসফাক উল্লা বলছেন, কনডেম সেলের জানালা দিয়ে তাঁর ভোর দেখতে ভাললাগা ও পাখীর ডাক শোনার কথা ও কাহিনীর কথা। সুতরাং ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম আসলে এক আলোরই গল্পমালা। ■

করুণার সিন্ধু বিদ্যাসাগর

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন করুণার সিন্ধু। দীনজনের প্রতি তাঁর অপার করুণা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ – পুরুষোচিত। এই জন্য তাহা সরল ও নির্বিকার।" তাই দেখি কার্মাটাড়ে এক মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হলে, বিদ্যাসাগর স্বয়ং তার কুটিরে উপস্থিত থেকে স্বহস্তে তার সেবা করতে কুণ্ঠিত হননি। বর্ধমানে বাসকালে তিনি তাঁর প্রতিবেশী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে সেবাযত্ন করেছিলেন।

শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁর সহোদরের জীবন চরিতে লিখেছেন, "অন্নসত্রে ভোজনকারিণী, স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেককে দুই পলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা তৈল বিতরণ করিত তাহারা পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় তফাত হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজ মহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাখাইয়া দিতেন।"

১২৭২ বঙ্গাব্দে বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনাবৃষ্টির কারণে ধান এবং অন্যান্য শস্য ফলেনি। কৃষকের ঘর ধানশূণ্য। বুনোওল ও কচু খেয়ে গ্রামবাসীরা দিনপাত করছিল। তখন

লেফ্টেনান্ট গভর্নর বীডন সাহেবকে দিয়ে গ্রামে গ্রামে অন্নসত্র খোলালেন বিদ্যাসাগর। আর নিজ জন্মভূমি বীরসিংহ ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে অন্নসত্র স্থাপন করলেন তিনি। কুড়িটি পরিবার প্রত্যহ সিদা নিতে লজ্জা পেতেন। সেজন্য বিদ্যাসাগর তাঁদের নগদ টাকা দিতেন। যে সব ভদ্রপরিবারে বস্ত্র ছিল না, তাঁরা প্রকাশ্যে বস্ত্র নিতে লজ্জা পেতেন। তাই বিদ্যাসাগর প্রায় দুই হাজার টাকার বস্ত্র গোপনে বিতরণ করেন। যাঁরা ভিক্ষা করতে আসতেন, বিদ্যাসাগর তাঁদের কাউকে পঞ্চাশ টাকা, কাউকে একশ টাকা, আবার কাউকে বা দু'শ টাকা দান করতেন।

মফসল পরিভ্রমণকালে পথের মধ্যে কোন পীড়িত, চলৎশক্তিহীণ ব্যক্তিকে পড়ে থাকতে দেখলে, তাকে পালকিতে চাপিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে গিয়েছেন। কার্মাটাড়ে কলেরা মহামারীর সময় সাঁওতাল পল্লীতে এবং বর্ধমানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীদের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেছেন। শুধু ওষুধ নয়, পথ্য দিয়েছেন। রোগীর শিয়রে বসে সেবা করেছেন। জাত বা ধর্ম মানেননি কোনদিনই। পীড়িত বর্ণহিন্দু, সাঁওতাল তথা মুসলমান, যে কোন মানুষকেই সেবা করে গেছেন নির্বিচারে। রোগীদের চিকিৎসার জন্য নিজের খরচে স্থাপন করেছেন ডিসপেনসারি। সেই ডিসপেনসারিতে যারা অসুস্থতাবশত আসতে পারত না, করুণাময় বিদ্যাসাগর তাদের ঘরে ওষুধ পৌঁছে দিয়েছেন। দরিদ্র, পীড়িত, অসহায় মানুষই ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বর।

ঈশ্বরের তো কোন জাত নেই! ■

প্রবন্ধ

বিদ্যাসাগর

তাপস কুমার চক্রবর্ত্তী

আজ আলোচনা সভায় সুশোভন উপস্থিত ছিল। সুশোভন শিল্পী মানুষ, ছবি আঁকে। নিজের আনন্দ বেদনা, আশা হতাশা সমস্ত অনুভব, রং তুলির মুখেই প্রকাশ করে। তাই এইসব আলোচনা সভায় সে নীরব, একনিষ্ঠ শ্রোতা। আজকের আলোচকদের মধ্যে থেকে এক একজন উঠছেন বক্তব্য রাখতে। তাঁদের অবস্থা দেখে সুশোভন বিস্ময়ে হতবাক।

এঁরা কেউ বিদ্যাসাগরকে চেনেনই না। বিদ্যাসাগর আজকের দিনে, বাঙালী সমাজের কাছে একেবারে অজ্ঞাত! কারও কথায় এতটুকু আন্তরিক অনুভব নেই। শুধু গুগুল সার্চ করে মুখস্থ করা ক'টা নিষ্প্রাণ বাক্য মাত্র। অথচ ভাবে ভঙ্গিমায় নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে প্রতিপন্ন করতে মরিয়া।

সুশোভন ছবির জগতের লোক। এরকম পাবলিক দেখেনি এমন নয়। সেন্ট্রাল কোলকাতার কোনো প্রদর্শনশালায় বসে বসে, সে শুনেছে আঁতেলদের ছবি দেখে মন্তব্য করতে। ছুটির দুপুরে ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসে কেউ কেউ ঢুকে পড়ে চিত্র প্রদর্শনির গ্যালারীতে। 'আমরা বাঙালী'র আন্তরিক অহংকার, কোনো বিষয় বুঝি না, এমন

হতেই পারে না। তাই শুধু চুপচাপ দেখে গেলে হবে না, সঙ্গীদের সঙ্গে নাতিউচ্চ স্বরে কিছু বিশেষজ্ঞের মতো মন্তব্য প্রকাশ করা চাই। আমাদের সাধারণ পাবলিক কখনই নিজেকে সাধারণ ভাবতে রাজি নই। যে কোন বিষয়ের সমালোচনা করতে সর্বদা দশ পা এগিয়ে আছি। আজকের আলোচনায় তেমনই সুশোভন শুনছে; কেউ বলছেন, আহা! অসাধারণ শিল্পী। কেউবা, অসাধারণ তুলির টান। কেউ হয়তো বললেন, কত বড় শিল্পীর শিষ্য। জানেন আমিও না, ওনার কাছে আমার মেয়েটাকে শেখাবো ঠিক করেছি। অন্য একজন আঁতলামির পারা চড়িয়ে বলে উঠল, মুঘল আর্টের সঙ্গে বাংলার পট প্যাটার্ণের কি অসাধারণ মেলবন্ধন। আরও একজন বলল, এই এখানটায় দেখো, ঠিক যেন সালভাদর দালি, আর ঐ কোনটায়, স্ট্রোকটা যেন একদম পাবলো পিকাসোর তুলির টান। আরও এক বিশেষজ্ঞ দাড়ি চুলকে বলতে থাকলেন, বিমূর্ত ছবিও যেন কথা বলছে, এর মধ্যেও একটা গল্প আছে। ঠিক যেন কীটস-এর কবিতার মতো। সুশোভন প্রদর্শনশালার একটা কোণে বসে বসে, কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গলে চুরুট গুঁজে, নির্বিকার ফুঁ দিচ্ছে। অর্ধনিমীলিত চোখে কল্পনার লে-আউটের বুকে এদের প্রত্যেকের ভিতরটা এঁকে নিচ্ছে যন্ত্রনার আঁচড় কেটে কেটে। যখন নীরব শিল্পীকেও কিছু বলতে বাধ্য করা হল, তখন সুশোভন বলল, "আমার আঙুলে তুলি ছিল ঠিকই, তবে আমি জানিনা

ঐ পট কে আঁকলেন? আমার প্যালেটে অনেক রং অবশিষ্ট আছে, তবুও আমি জানি না, ঐ পটচিত্রে এতো বিচিত্র রং কে ভরে দিল? বিদ্যাসাগর এমনই একটা স্বতন্ত্র ও স্বতঃস্ফূর্ত সৃজন, এই আমাদের বিশ্বমানব সমাজে। সমাজের প্রয়োজন সময়ে সময়ে এভাবেই অনাগতকে আহ্বান জানায়, তখনই বিদ্যাসাগরের উদ্ভব সম্ভব হয়। ঠিক যেমন ক্যানভাসের আর্তি হয়ে কল্পনার আবেদন প্যালেটের অনাগত রংকে আসতে বাধ্য করে। উপেক্ষিত হয় বর্ণালীর যন্ত্রণা, তখন সার্থক হয় সৃজনশীলতার মর্মদাহ। আর যা কিছু এতক্ষণ শুনলাম, সবই উপলক্ষ্য মাত্র। প্রাচীন ঐতিহ্য ও তার ঐশ্বর্য্য নিয়ে সমসাময়িকতাকে চালিত করেছেন ভবিষ্যতে। বিদ্যাসাগর গণ্ডিবদ্ধ ভূগোলের পাতায় লিখে গেছেন বিশ্বৈকানুভুতির স্তোত্র। তিনি যেন বাংলা বাউলের সুর, আকাশ বাতাস পরিব্যপ্ত হয়েও ছড়িয়ে পড়েছেন চিদাকাশে। তাঁর বিস্তার উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায়। তিনি যেন শিল্পীর তুলির গভীর অথচ সীমাহীন টান। যার শুধু বোধ আছে, দর্শন আছে কিন্তু দৃশ্য নেই। আজ পর্যন্ত আমরা সবাই তাঁরই বর্ণমালার অস্তিত্ব রক্ষার মাধ্যমে, একটা বৃহৎ স্মৃতির বিমূর্ত প্রবাহকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়বদ্ধ। সেই যে বৃহৎ বিমূর্ত জগতের সংক্ষিপ্ত মূর্তি তার মাধ্যমে আজও আমরা এই জগতের তরুলতা পশুপাখির সঙ্গে একটা জন্মান্তরের ঐক্য অনুভব করতে পারি।

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন..." অনেকেই নিজ নিজ জীবন পথে লক্ষবার হয়তো আবৃত্তি করেছি। কাজে লাগাতে পারিনি। বলা ভাল সে সদিচ্ছা আমাদের ছিল না। কিন্তু আবৃত্তি না করেও জীবন দিয়ে, কাজ দিয়ে, অনুভব দিয়ে যিনি এই আর্য-উক্তি সার্থক করলেন, পরাধীন দেশের বারুদ গন্ধি মাটিতে দাঁড়িয়ে, তিনি এক ও অনন্য বিদ্যাসাগর। ইংলিশ ডিসে সংস্কৃত পরমান্ন পরিবেশন করলেন, লোভী সমাজপতিদের কালসর্প জিহ্বায়।

সুশোভনের বলা হয়ে যেতেই, সে উঠে বাড়ির পথ ধরল। তার ভিতরের কষ্টটা, ক্ষোভটা সবার কাছে প্রকাশিত হোক – এটা তার কাম্য নয়। তার বাড়িতে আঁকার টেবিলের সামনে, একটা পোট্রেট, দেওয়াল থেকে এমন উচ্চতায় ঝোলানো আছে, যাতে গোটা ছবিটা একসাথে তার দৃষ্টিগোচর হয়।

'আদর্শ' সব কালে সব দেশেই বিমূর্ত। সেই আদর্শ যে সময় কালে মূর্তিমান হয়, মানব সভ্যতার ইতিহাসে তার গুরুত্ব অপরিসীম। সুশোভন দেখছে, এই ছবির মূর্তিটি আজও আমাদের কাছে বিমূর্ত ভাস্কর্য্যের মতোই, বেশীর ভাগ মানুষের অনুভবে অনাবিষ্কৃত থেকে গেল। সমাজ আর তার কুসংস্কারের কাঁথায় দাউ দাউ আগুন জ্বেলে দিল যে মূর্তিমান, তাকে কিনা ফুল মালার আড়ালে পাঠিয়ে, আজ আমরা শিক্ষা সভ্যতার ঠুনকো বড়াই করে চলেছি। তিনি নিজেই একটা বিশাল মাপের সমাজ গঠনের শিল্পী। তাঁর কাজ দিয়ে, তিনি

করুণাময়তায় পাথরে ফুল ফুটিয়েছেন। ইস্পাত মুষ্ঠির আঘাতে সমাজ নামক গ্রানাইট গুঁড়িয়ে তাতে সভ্যতার মানব জমিন তৈরী করেছেন। পতিতোদ্ধারক এই শিল্পীর, দৃঢ় রংহীন তুলিটি চলতে গিয়ে আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, তুলির তন্তুগুলি কিন্তু ভোঁতা হয়ে যায়নি। খসে পড়েনি একটিও। দিনে দিনে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। সভ্য মানুষের দর্শন স্বীকার করেছে, জ্ঞানের বৃহত্তর ভাণ্ডারও কোন সমাজের কোন কাজে আসে না, যদি না চরিত্রের দার্ঢ্য সপ্রমাণ হয়। তাঁর চিবুকের স্ট্রোকে শিল্পী এঁকেছেন চারিত্রিক দৃঢ়তা। কপালের বিস্তারে মূর্ত হয়েছে জ্ঞান সমুদ্রের সীমাহীন বালুকাবেলা। চোখের করুণ চাহনিতে নির্বিচারে সকল পীড়িতের জন্য করুণার কারুবাসনা – যে বাসনা যেখানে যত বঞ্চিত, লাঞ্ছিত সবার মুক্তি চাইছে। যত বাঁধা পাচ্ছেন ততই দৃঢ় হচ্ছে সংকল্প, তা চিত্রিত হয়েছে, কঠোর গণ্ডদ্বয়ের বিনির্মানে। একটি মুখাবয়বে এভাবে সমগ্র মানব সমাজের, সকল শুভ সংকল্প আঁকা যায়, তা কি কোন শিল্পীর জানা ছিল? একটি বিমূর্ত আধারে, একটি জাতিসত্ত্বার শিক্ষা সংস্কার ও চেতনার কর্ম নৈপুন্য মূর্ত হয়ে আছে। কুৎসা কলঙ্কের কাঁটা বিঁধে বিঁধে যে রক্ত ঝরে পড়েছিল মাটিতে, সেই মাটির মহিমায় এদেশের আকাশ বাতাস আর জল একত্র হয়ে নির্মাণ করেছিল একটা অবিস্মরনীয় আদর্শ চরিত্র দর্শনের মুর্ত সংস্করণ, তিনিই আমার আমাদের প্রতিদিনের স্মরণীয়, বিদ্যাসাগর মশাই। ■

একুশের আকাশ

সংহিতা ভট্টাচার্য্য

বাংলা আমার বর্ণমালা
আমি বাংলায় গাঁথি বকুলের মালা।
বাংলা আমার অধিকার
আমি বাংলায় খুঁজি বাংলার মুখ আবার।

বাংলা অমর শহীদের গান
আমি বাংলায় শুনি আজো দীপ্ত শ্লোগান।
বাংলা আমার মাতৃভাষা
বাংলা গানের সুর আমার ছন্দের ভাষা।

আমি বাংলায় লিখি কবিতা
বাংলা আমার প্রিয় কবির কথা।
আমি বাংলায় করি প্রতিবাদ
আমি বাংলায় করি আবাদ।

আমি বাংলায় কাঁদি বাংলায় হাসি
একুশের আকাশে দেখি বাংলা রাশিরাশি।
বাংলা আমার আহ্লাদের সুখ
আমি বাংলায় এঁকে বেড়াই আমার মায়ের মুখ। ■

আমার সোনার বাংলা

রিয়া মিত্র

জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের বিশাল বড় অ্যাপার্টমেন্টটা থেকে বেরিয়ে ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য রওনা হলেন নবীন। নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করে যান, তাঁর বাড়ি থেকে ইউনিভার্সিটি বেশি দূর নয়। কর্মসূত্রে নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর বিদেশে চলে এসেছেন বহু বছর হলো কিন্তু মনেপ্রাণে এখনও তিনি খাঁটি বাঙালি। নিজের বাংলাকে, নিজের মাতৃভূমিকে তিনি এখনও আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালির মতোই... বা বলা যায়, তাঁদের থেকেও বেশি ভালোবাসেন।

গাড়ি চালাতে চালাতেই মনে পড়ে, আত্মীয় স্বজনের তির্যক মন্তব্য। যখন বহু বছর আগে দেশ ছেড়ে বিদেশ চলে আসছিলেন, তখন কানে এসেছিল অনেক রকম কথা। পিসিরাই বলেছিল, নিজের দেশকে, নিজের ভাষাকে যে এত ভালোবাসে, তার কি এই দেশে চাকরি জুটলো না নাকি গোরা সাহেবদের পা চাটার জন্য ঐ দেশভক্তির ভড়ং ছেড়ে বিদেশে ছুটতে হলো, বুঝি না, বাপু!

পুরানো চিন্তাগুলো ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে গেলেন তিনি ইউনিভার্সিটি। গাড়ি থেকে নেমে সোজা হয়ে হাত দুটো দু'পাশে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি, বুকটা গর্বে ভরে

উঠছে, চোখে জল টলটল করছে, সামনের কমিউনিটি হলে এখানকার সমস্ত বাঙালিরা এক সুরে তখন গান গাইছে, "চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি..."

আজ যে একুশে ফেব্রুয়ারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আজ বাবার কথা খুব মনে পড়ছে তাঁর, বাংলা ভাষাকে খুব সমীহ করতেন, খুব শ্রদ্ধা করতেন, খুব ভালোবাসতেন বাবা। বাবার স্বদেশপ্রেমে নিজেও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। নিজের জীবনটাও বাবা এই ভাষার জন্যই উৎসর্গ করেছিলেন। বাবার স্বপ্নপূরণ করার জন্যই বিদেশের ইউনিভার্সিটিতে এসেও বাংলা ভাষার ওপরই গবেষণা করে এখানকার ছাত্রদের ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বাংলা ভাষার শিক্ষা দেন তিনি।

বাবার স্বপ্ন ছিল, বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক স্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার। আজ ছেলে হয়ে সেই স্বপ্ন তিনি পূরণ করতে পেরেছেন। বাংলার প্রতি সম্মান জানিয়ে আপনা থেকেই তাঁর মস্তক অবনত হয়ে এলো, কানে ভেসে আসতে লাগলো, "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি..." ■

আমার প্রাণের বাংলা

সমীর দাস

কত ভাষা মনে বাসা, তবু তুমি রক্তে
মাতৃভাষা বঙ্গভাষা, মোদের গরব।
এই মন সর্বক্ষণ, তোমাতে যে ব্যক্তে
মহাধন আজীবন, তোমাতে সরব।

দেবভাষা তব বাসা, প্রাকৃতে প্রকাশ
পরিভাষা উপভাষা, কত সমৃদ্ধতা।
মনোময় কত লয়, যেন মহাকাশ
সব সয় তবু রয়, তটিনী বহতা।

কত গান কত তান, তোমার সুভাষে
ভরে প্রাণ ভরে কান, মধুর সঙ্গীতে।
কত কথা কত গাঁথা, লেখা অভিলাষে
হেথা হোথা সেই কথা, বিখ্যাত সাহিত্যে।

অনির্বাণ তুমি প্রাণ, বাংলা আমার
দীপ্তমান তীর্থস্থান, নমি বারবার। ■

Photo by Lisa Fotios from Pexels

বাংলা আমার শিরায় উপশিরায়

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

শুনেছিঃ
মাতৃ জঠরেও আধো চেতনায় দুলে উঠতাম
যখন বাংলায় কারও আহ্বান শুনতাম...

তারপর ভূমিষ্ঠ হলামঃ
জীবনের প্রারম্ভে সচেতন কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট
প্রথম শব্দটি ছিল বাংলায় সৃষ্ট।
জননীকে একদিন ডেকে উঠলাম 'মা' বলে,
আজও আমি খেলা করি বাংলার শব্দ মহলে...

ভেসে চললাম জীবনের স্রোতেঃ
কত কথা বলেছি এ জীবনে, তার তো হিসাব নাই।
তবে জানি, বক্তব্য রাখতে বাংলাতেই বেশি জোর পাই।
বাংলা ভাষায় আমি নিজের কথা বলি,
আমি পৃথিবীর কাছে মনের জানালা খুলি...

দীর্ঘ চলার পথে থমকে দাঁড়িয়েছি বহুবারঃ
তবু, আমি স্বপ্ন দেখি বাংলার শব্দে
আমার স্মৃতিগুলো আটকে আছে বাংলার অব্দে।
বিগত চার দশকে, অনেক ভাষার সংস্পর্শে এলাম,
কিন্তু বাংলাতেই আমার মননের গভীরতা খুঁজে পেলাম। ■

কবি মনে টুকরো পত্র

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

স শ্রদ্ধেয় কবি,

গত কয়েক দিনের মেঘ-বৃষ্টির খেলাকে জব্দ করে একটা রোদ ঝলমলে সকাল উপহার... এইটা হয়তো ভাবনাতীত ছিল। তবে আশা ছিল তুমি নিরাশ করবে না। আসলে সেই যে তুমি উষ্ণ -শীতল বাতাসে কানে কানে বলে গিয়েছিলে, "খোল দ্বার খোল... লাগলো যে দোল।" তোমার সেই ডাকেই তো সাড়া দিয়ে সকালটা এতো সুন্দর ভাবে রামধনু রঙে সেজে উঠেছে। শহুরে প্রকৃতিকে ঢেকে রাখা এই উঁচু উঁচু অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় গুটিকতক সুশোভিত ও সুসজ্জিত পলাশের দল। তাতেই হয়তো খুঁজে পাই "রাঙা হাসি রাশি রাশি..." তবে বসন্তের শোভা তোমার ওই নীল দিগন্তেই বড়ো বেশি উজ্জ্বল, স্বতস্ফূর্ত ও সাবলীল। এখানেতো সব রঙের মানেই এখন রঙিন ভনিতা। সেই সুর সেই সাহিত্যের বাঁধন সবই যেন অন্তর্হিত হয়েছে। অন্তরের আন্তরিকতা এখন প্রায় যান্ত্রিকতার মোহতে মোহিত হয়ে আছে। তবে আশা রাখি, একদিন আবার তোমার শেখানো প্রতিটা শব্দ সকল অচল আয়তনের গণ্ডি পেরিয়ে তোমার সুরে গেয়ে উঠবে, "রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাওয়ার আগে..."

ইতি

প্রকৃতি ■

চিত্রমালা

Photo by Gautam Ganguly on Unsplash

Photo by Ujjwal Jajoo on Unsplash

Photo by Rajashree Dutta (Neelanjana)

প্রবন্ধ
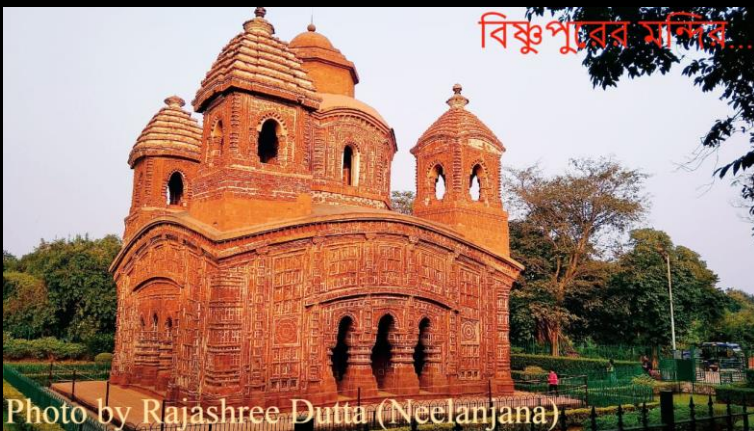
বিস্মৃত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ইন্দ্রাণী ঘোষ

সাবেক কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে পৌঁছুলে দেখা যাবে, রবীন্দ্র সরণীর অতি ব্যস্ত ঘন জনবসতির মধ্যে দিয়ে আজও ডালহৌসি অভিমুখী ট্রাম ছুটে চলেছে, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিবেকানন্দ রোড ছুঁয়ে পায়ে পায়ে দক্ষিণে সামান্য এগুলে ডান দিকে তাকালে দেখা যাবে কাঁচের প্রাসাদোপম, বছর দুই তিন আগে গজিয়ে ওঠা বিগ বাজার... ঠিক তার বিপরীতে রবীন্দ্র সরণীর বাঁদিকে ঢুকে গেছে এক অতীব সংক্ষিপ্ত অপরিসর কানাগলি, অসামান্য এক রাজপুরুষতুল্য ব্যক্তিত্বের নামে। দ্বারকানাথ টেগোর লেন! হাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন, ইনিই প্রিন্স দ্বারকানাথ, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ, যাঁর সময়কাল থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির বিভিন্ন ঘটনা নতুন খাতে বইতে শুরু করে। বাড়ির যশ, খ্যাতি, পরিচিতি – ইত্যাদি সব কিছুই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঠাকুরবাড়ির ভাগ্যের চাকাটি নতুন উদ্যমে বৈভব ও প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলে।

এই নাতিদীর্ঘ গলিপথটির শেষ প্রান্তে আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রক্তবর্ণের সুরম্য এক অট্টালিকা। ঠিকানা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি, ৬ নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। মূলত উত্তর

দক্ষিণে যার বিস্তার। মূল বাড়ির পশ্চিমে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে নকশা করা অনন্য স্থাপত্য কীর্তি 'বিচিত্রা' গৃহ। শোনা যায় এক সময় রবীন্দ্রনাথ এই বিচিত্রা বাড়ির ঝুলবারান্দা থেকে পশ্চিম দিকে গঙ্গার বহে যাওয়া দেখতেন। এক সময় এই বাড়ির মহিলারা পালকি চেপে গঙ্গা স্নান করতে যেতেন। পালকিসহ তাঁদের গঙ্গায় চুবিয়ে গঙ্গা স্নান পর্ব সম্পন্ন হতো। আজ আর গঙ্গা নদী জোড়াসাঁকো থেকে দৃশ্যমান নয়, কারন দৃশ্য পথটি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে, উন্নয়নের দৃষ্টান্ত স্বরূপ পরিকল্পনা-বিহীন প্রতিস্পর্ধী কংক্রিটের অসংখ্য বাড়ি। এই ভীড়ে ক্রমে হারিয়ে গেছে একদা জোড়াসাঁকো বাড়ির প্রতিবেশ, পরিবেশ।

স্মৃতির আরশি ক্রমশ ঝাপসা হবার সাথে সাথে – ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এসেছে এই বাড়িতে বসবাসকারী অসংখ্য সভ্যদের জীবন ও অবদান।

১৭৮৪ সালে নীলমনি ঠাকুরের হাতে এ বাড়ির গোড়া-পত্তন হলেও, এর প্রকৃত বিস্তার ঊনবিংশ শতকে। শতাব্দী জুড়ে এই বাড়িতে জন্মগ্রহন করেছেন, একদল নারী পুরুষ, যাঁদের মধ্যে অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মতো জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন না করলেও ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণে তাঁদের ভূমিকাও কোনোভাবেই কম ছিলোনা। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উক্তিকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে... তিনি মনে করতেন এনারা সকলে মিলে

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবি হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটটি রচনা করেছিলেন, এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিভাশালী। সেই সময়ের নিরিখে বাংলার সমাজ সংস্কৃতি নতুন ভাবে উদ্দীপিত করার কাজে এঁদের অবদান ছিলো অসামান্য এবং চিরস্মরণীয়।

আজ আমরা এমনি একজন এই বাড়ির সদস্যের কথা আলোচনা করবো। তাঁর নাম সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ থেকে প্রায় একশো একান্ন বছর আগে এই গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জেষ্ঠ্য পুত্র রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি ছিলেন পঞ্চম সন্তান। ১৮৮৬ সাল নাগাদ, তিনি কলকাতার মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন ১৮৯০ সালে। ঐ একই বছরে আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়েছিলেন তিনি। ১৮৯১ সাল থেকে তাঁর সম্পাদনায়, 'সাধনা' পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু করে। অবশ্য পত্রিকা প্রকাশনার সিংহভাগ দায়িত্ব সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ। ক্রমান্বয়ে তিন বছর তিনি সম্পাদনার গুরু দায়িত্বটি সামলে ছিলেন।

এরপর ১৮৯৪ সালের ২৫শে মে, ঢাকা বিক্রমপুরের ব্রাহ্ম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা চারুবালার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে বাঁধা পড়েন সুধীন্দ্রনাথ। এই শুভকর্ম উপলক্ষে, রবীন্দ্রনাথ

রচনা করেছিলেন একটি গান... "বাজিল কাহার বীনা মধুরস্বরে..." গানটির নীচে কবি নিজে লেখেন... 'সুধীর বিবাহদিনে'। পরবর্তী সময়ে, দুই পুত্র ও তিন কন্যার বাবা মা হয়েছিলেন এই দম্পতি। তাঁদের সন্তানেরা ছিলেন, যথাক্রমে, রমা, এনা, সৌম্যেন্দ্রনাথ, স্বরীন্দ্রনাথ ও চিত্রা।
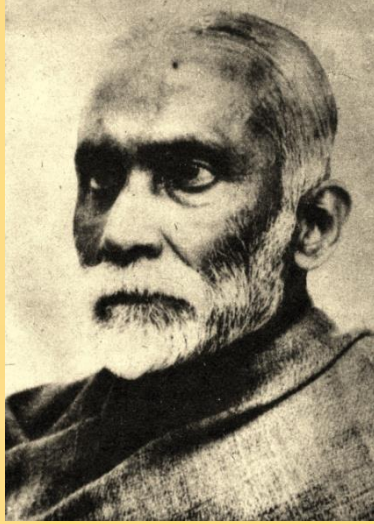
সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুধীন্দ্রনাথ ঐ বছরেই বি.এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ওকালতি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন।

ঠাকুরবাড়ির "খামখেয়ালি সভার "একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। বাড়ির ছোটদের নিয়ে তাঁর অনেকটা সময় অতিবাহিত হত। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিচারণে "জীবনের ঝরাপাতা" গ্রন্থে জানিয়েছেন সে কথা – "আমাদের নেতা

ছিলেন সুধিদাদা, বড়মামা দ্বিজেন্দ্রনাথের পুত্র। তিনি রবিমামার অনুকরণ করে ঠিকই ঠিকই সেই রকম বাল্মীকি সাজতেন, নিজের হাতের লেখাটিও তাঁর লেখার প্রায় অবিকল প্রতিরূপ করে তুলেছিলেন তখন তিনি প্রখ্যাত হননি।" সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাবার সম্পর্কে লিখেছেন... "পিতার গানের গলা ছিলোনা, কিন্তু খুবই সুরবোধ ছিলো, আর তাঁর বাজনার হাত ছিলো খুবই মিষ্টি। বাড়িতে থিয়েটার এর সময় জ্ঞানের সঙ্গে তিনিই বাজাতেন অর্গান বা পিয়ানো।"

প্রায় আমৃত্যু সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত থাকতে তাঁকে আমরা দেখি। তাঁর রচিত উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সমন্বিত মোট এগারোটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।

১৯২৯ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরাকে চিঠিতে লেখেন... "আজ সকালে সুধীর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছে। আমরা কেউই জানতে পারিনি যে তাঁর সাংঘাতিক পীড়া হয়েছে... তিনদিন আগে খুব হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলো তারপরেই আজ হঠাৎ এই বিপদ..."

প্রায় বিস্মৃত, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম এই *সদস্যের আজ জন্মদিন। আসুন সকলে মিলে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। ■

*সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ১৩ই জুলাই, ১৮৬৯। আজ থেকে কয়েক বছর আগে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে ঐ দিনটি পালন উপলক্ষে ইন্দ্রাণী দেবী ওখানে এই লেখাটি পাঠ করেছিলেন।

‘বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী’ কেমন লাগল তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। যাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের চর্চা ভালবাসেন, কিন্তু এখনও ‘পাণ্ডুলিপি’র সদস্য হয়ে উঠতে পারেননি, তাঁদের সবাইকে অবিলম্বে **‘পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)**’-এ যোগদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

‘পাণ্ডুলিপি’র প্রকাশিত মাসিক ই-পত্রিকা ‘গুঞ্জন’ আজ বিভিন্ন দেশের বাঙালি পাঠক গোষ্ঠীর কাছে সুপরিচিত এবং সমাদৃত। ‘গুঞ্জন’এর প্রতিটি সংখ্যাই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়।

সমকালীন সাহিত্যিকদের রচনা পড়তে এবং নিজের সুপাঠ্য রচনাসমূহ প্রকাশ করতে ‘পাণ্ডুলিপি’র ‘নিঃশুল্ক প্ল্যাটফর্ম’-টি অবশ্যই ব্যবহার করুন। আসুন একসাথে আমাদের ভাষার চর্চা করি। বাংলা ভাষা দীর্ঘজীবি হোক।

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com